মানুষ-কুমীর

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

মানুষ-কুমির

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পরশপাথর প্রকাশন

মানুষ কুমির হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
পরশপাথর প্রকাশন
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব ঈশিতা দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শ্রীমন্ত দাস

প্রকাশক অরিন্দম বসু
পরশপাথর প্রকাশন
১২সি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অক্ষরবিন্যাস পরশপাথর

মুদ্রণ জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য ৮০ টাকা

উৎসর্গ

ঈশিতা, মধুজা ও সোমাকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচিপত্র

মানুষ কুমির	৭
তেজকাৎলিপোকার পিরামিড	৫৩
নেকড়ের নিমন্ত্রণ	৮০
রামেসিস রা-এর রক্তধারা	৮৯
রেডিয়োর বন্ধু	৯৮
হিরোহিতোর গবেষণা	১১০
দেবতার চাবি	১২৩

মানুষ-কুমির

সন্দীপ যখন নেতিধোপানি থেকে রওনা হয়েছিল তখনও ভোরের কুয়াশা ভালো করে কাটেনি। আগের দিন সে রাত কাটিয়েছে ওখানকার এক বনবাংলোয়। রাতে তার ঘুম হয়নি। সারা রাত কেটেছে একটা চাপা উৎকণ্ঠার মধ্যে। তাঁর সঙ্গে শেষপর্যন্ত দেখা হবে তো? সূর্য এখন মাথার উপর, নদীর জলে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব। গাঙ বেয়ে এগিয়ে চলেছে নৌকো। দু-পাশে গহিন জঙ্গলে। মাঝে মাঝে তার বুক চিরে বেরিয়ে গিয়েছে খাঁড়ি। দিনের আলো সেখানে ভালো করে ঢোকে না। গাঙ বেয়ে এগিয়ে নদী যেখানে দু-ভাগে ভেঙেছে, সেখানে পৌঁছে, যে মাঝি দাঁড় বাইছিল সে অনেক দূরের একটা কালো বিন্দু দেখিয়ে বলল, "ওই হল চামটা। এখনও ভেবে দেখুন বাবু, ওখানে যাবেন কিনা। সুন্দরবনের তামাম বাঘের ঠিকানা ওই চামটা আর হলদি। বন্দুক কাঁধে নেওয়া ফরেস্ট গার্ডরা পর্যন্ত ওখানে যাওয়ার আগে দশবার ভাবে।"

তার কথা শুনে সন্দীপ বলল, "তোমরা নয় খাঁড়ির বাঁকে দ্বীপ যেখানে শুরু হচ্ছে সে পর্যন্ত আগে চলো, তারপর ফেরার কথা ভাবা যাবে। ওখানে আমার জন্য একজনের অপেক্ষা করে থাকার কথা।"

তার কথা শুনে নৌকার মাঝি দু-জন এমনভাবে তাকাল যে, সন্দীপ স্পষ্ট বুঝতে পারল, কথাটা ওদের মোটেই বিশ্বাস হয়নি। অবশ্য এ ব্যাপারে তাদের দোষ দেওয়াও চলে না। একে তো জায়গাটা সুন্দরবন, তার উপর আবার দ্বীপের নাম চামটা। বাঘেদের একেবারে স্বর্গরাজ্য। সেখানে যে কোনো লোক বাঘের পেটে না গিয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। মাঝিদের ওই দ্বীপের কাছে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। নেহাত এই বাবুর কাছ থেকে ভুল করে মোটা টাকা নিয়ে নিয়েছে তারা, তাই সন্দীপের কথা শুনে আবার দাঁড় টানতে শুরু করল। নদীর দু-পাশে জেগে আছে বিস্তীর্ণ চর, তার একটু দূরে শুরু হয়েছে সুন্দরী, কেওড়া, বাইনের ঘন জঙ্গল, হেঁতালের ঝাড়। সন্দীপ অবশ্য কোনো গাছই চেনে না। এই জল-জঙ্গলের দেশে

BanglaBook.org

সে প্রথম এসেছে। নৌকোয় বসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবছিল সন্দীপ। শেষপর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সন্দীপের দেখা হবে তো? তাঁকে সন্দীপ যতটুকুচেনে, তাতে তাঁকে কোনোদিন ফালতু কথা বলার লোক মনে হয়নি। নিছক তামাশা করার জন্য এই জল-জঙ্গলের দেশে সন্দীপকে তিনি টেনে আনবেন বলে মনে হয় না। বিশেষত, তিনি যখন ভালো করে জানেন যে, তিনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন তাঁর ডাক অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সন্দীপের নেই। কারণ, তিনিই সন্দীপের অন্নদাতা, আর সন্দীপ অকৃতজ্ঞ নয়।

কেন সন্দীপ আজ নৌকোয় চেপে দূরের ওই কালো বিন্দুর দিকে এগিয়ে চলেছে সে ব্যাপারটা একটু খুলে বলা ভালো। যার আমন্ত্রণে সন্দীপ এই জঙ্গলময় দেশে হাজির হয়েছে, তিনি প্রফেসর নীলকান্ত সোম। যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই সন্দীপের। তাঁর সঙ্গে সন্দীপের প্রথম পরিচয় বছর দশেক আগে কলেজের স্পোর্টসে। সন্দীপ তখন মাত্র কয়েক মাস হল তার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সন্দীপের ছেলেবেলাতেই ওর বাবা গত হয়েছিলেন, আর মা চলে গেলেন সে কলকাতায় চলে আসার মাস ছ-য়েক আগে। ফলে গ্রামে আর পিছুটান না থাকার জন্য কলকাতা শহরে হাজির হয়েছিল সে। সেদিন কলেজে স্পোর্টস। সন্দীপ স্পোর্টসে নাম দিয়েছিল বাহবা কুড়োবার জন্য নয়, তার তখন প্রচণ্ড অর্থকষ্ট চলছে। মেসের ভাড়াও বাকি পড়ে গিয়েছে। সন্দীপ বরাবরই খেলাধুলোয় ভালো। তার উদ্দেশ্য ছিল স্পোর্টসে যদি সে প্রাইজ জিততে পারে তাহলে সেগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা জোগাড় করতে পারবে। সেদিনের স্পোর্টসে ভাগ্যলক্ষ্মী মনে হয় প্রসন্ন হয়েছিলেন সন্দীপের প্রতি। পাঁচ-পাঁচটা ফার্স্ট প্রাইজ জিতে নেয় সন্দীপ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সেদিন প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন জীববিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক নীলকান্ত সোম। পুরস্কার দেওয়া শেষ হয়ে গেলে মঞ্চ থেকে নেমে তিনি ডেকে নিয়েছিলেন সন্দীপকে। সন্দীপের ব্যক্তিগত অবস্থা জানার পর, পরের দিন সকালে তিনি তাকে দেখা করতে বলেছিলেন তাঁর নিজের বাড়িতে। তাঁর কথা শুনে সন্দীপ পরের দিন সকালে গিয়ে হাজির হয়েছিল তাঁর উত্তর কলকাতার বিশাল বাড়িতে। সন্দীপ সেদিন ভেবেছিল তার দুরবস্থার কথা শুনে হয়তো তাকে কিছু অর্থসাহায্য করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন প্রফেসর। কিন্তু সন্দীপ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার পর তিনি অন্য প্রস্তাব দিলেন তাকে। তিনি বললেন, তিনি চান সন্দীপ তাঁর বাড়িতে থাকুক। তার বদলে তিনি সন্দীপের খাওয়াপরার দায়িত্ব নেবেন।

একা মানুষ তিনি, মাঝে মাঝেই গবেষণার কাজে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতে হয়। বাড়িতে তাঁর একটা গবেষণাগার আছে। বেশ কিছু দুর্মূল্য যন্ত্রপাতি আছে সেখানে। কিছু পশুপাখিও আছে। বাড়িতে বিশ্বস্ত কেউ থাকলে তার তত্ত্বাবধানে বাড়িটাকে রেখে নিশ্চিন্তে কাজে যেতে পারেন তিনি। প্রফেসরের এই লোভনীয় প্রস্তাবে না করার মতো

BanglaBook.org

কোনো কারণ ছিল না সন্দীপের। বরং বলা যেতে পারে, প্রফেসরে কথা শুনে সেদিন যেন হাতে চাঁদ পেয়েছিল সে। তার পরদিন থেকেই সে থাকতে শুরু করল প্রফেসরের বাড়িতে। কাজকর্ম বলতে সেখানে প্রায় কিছুই ছিল না। বাড়ি থাকলে প্রফেসর প্রায় সারাক্ষণই সময় কাটাতেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে, আর সন্দীপ থাকত তার পড়াশোনা নিয়ে। শুধু মাঝে মাঝে যখন প্রফেসর দিন কয়েকের জন্য তাঁর গবেষণার কাজে উধাও হয়ে যেতেন, তখন তাঁর বাড়ি আর পশুপাখিগুলোকে দেখভালের দায়িত্ব পড়ত সন্দীপের ওপর। থাকতে থাকতে প্রফেসরের সঙ্গে একটা স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সন্দীপের। যদিও প্রফেসর কথা বলতেন খুব কম। সব সময় তিনি ডুবে থাকতেন নিজের চিন্তার জগতে।

সন্দীপের কলেজের পাট শেষ হওয়ার পর তাকে একটা স্কুলমাস্টারির চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন প্রফেসর। সন্দীপ এখনও সেই চাকরিটাই করে। থাকে প্রফেসরের সেই বাড়িতেই। যদিও প্রায় বছর পাঁচেক হল, সে বাড়িতে আর নিজে পা রাখেননি প্রফেসর। যেদিন তিনি ওই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন, সেদিন সকালে তিনি নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সন্দীপকে। একতাড়া কাগজ তিনি সন্দীপের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "কাগজগুলো যত্ন করে রেখে দিও। এর মধ্যে বাড়ির দলিল এবং একটা উইল আছে। আজই আমার গবেষণার কাজের জন্য বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি। কাজ শেষ হতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। তারপর ফিরে আসব আমি। কিন্তু কোনো কারণে যদি দশ বছরের মধ্যে না ফিরি, তাহলে এই বাড়ি সহ আমার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হবে তুমি। আমার উইলে সে কথা লেখা আছে।"

সন্দীপ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "কোথায় যাবেন আপনি? সঙ্গে আর কে যাবে?"

প্রফেসর বলেছিলেন, "একলাই যাব, আর কোথায় যাব তা আমার গবেষণার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বলা সম্ভব নয়। আর একটা কথা, আমার কোনো খোঁজ করার চেষ্টা করবে না তুমি, তাতে আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। দরকার হলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব বা তোমাকে ডেকে পাঠাব।"

আর কোনো কথা বাড়াননি। সেদিন রাতেই বাড়ি ছেড়েছিলেন তিনি। এরপর পাঁচটা বছর কেটে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রফেসরের কোনো খোঁজখবর পায়নি সন্দীপ। এই বিরাট পৃথিবীতে যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান, তাহলে কীভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে তাঁর! ইদানীং তো সন্দীপের প্রায়ই মনে হত, প্রফেসরের সঙ্গে আর কোনোদিন বোধ হয় দেখা হবে না কিন্তু সে ধারণা বদলে গেল দিন সাতেক আগে। স্কুল থেকে দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে লেটার বক্সে একটা চিঠি পেয়েছিল সে। ঘরে এসে চিঠিটা খুলতেই তাতে প্রফেসরের হাতের লেখা দেখে চমকে উঠেছিল।

BanglaBook.org

তারিখবিহীন সেই চিঠিতে লেখা ছিল —

'প্রিয় সন্দীপ,

'আজ এতদিন পর আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি খুব আশ্চর্য হবে। এতদিন তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করিনি বলে হয়তো তুমি মনে দুঃখ পেয়েছ। এর কারণ আমার গবেষণার গোপনীয়তা রক্ষা করতে এখনও পর্যন্ত কিছু বাড়তি সতর্কতা নিয়ে চলেছি। আজ এই চিঠি তোমাকে লিখছি এক বিশেষ দরকারে। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, দীর্ঘদিন ধরে জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত এক জটিল গবেষণার কাজ করে চলেছি। ঠিক কী বিষয়ে আমার গবেষণা তুমি তা না জানলেও এই চিঠিতে তা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলি, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এক জনহীন জায়গায় একাকী কঠিন পরিশ্রম আর সাধনার মধ্যে দিয়ে শেষে তার ফল লাভ করেছি আমি, যা চমকে দেবে বিশ্ববাসীকে। কারণ, এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছি আমি। তার অন্তিম পর্যায়ে একটা কাজ বাকি, যার জন্য আমার এখানে তোমার আসা বিশেষ দরকার। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।

এবার বলি, কোথায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। তুমি কোনোদিন নাম শুনেছো কিনা জানি না, সুন্দরবনের গভীরে চামটা নামের একটা দ্বীপ আছে। তার চারপাশে কোনো জনবসতি নেই। জায়গাটা বাঘেদের খাসতালুক বললেও বেশি বলা হয় না। দ্বীপের চারদিক নদী আর খাঁড়ি দিয়ে ঘেরা। এই দ্বীপেই আমার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হবে। সুন্দরবনের দ্বীপ বলতে যা বোঝায় তা হল সবই নালা আর খাঁড়ি দিয়ে ঘেরা জঙ্গলময় ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। কয়েক মাইল লম্বা দ্বীপে কোথায় তুমি আমার দেখা পাবে এবং কীভাবে চামটাই পৌঁছবে, সে কথা তোমাকে বাতলে দিচ্ছি আমি। সজনেখালি থেকে পঞ্চমুখানী হয়ে নেতিধোপানি পর্যন্ত আসতে অসুবিধা হবে না তোমার। নেতিধোপানি হল সুন্দরবনের কোর এলাকার প্রবেশদ্বার। এরপরেই শুরু হয়েছে আসল সুন্দরবন, সত্যি সত্যি যেখানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। তাই বনবিভাগ সাধারণ মানুষকে এই অঞ্চলে আসার অনুমতি দেয় না। নেতিধোপানি থেকে জলপথে তোমাকে এগোতে হবে পূর্ব দিকে। তারপর তুমি হাজির হবে এক ত্রিবেণী সঙ্গমে। সেখান থেকে দক্ষিণে এগোবার পর বাঁ-পাশে যে দ্বীপটি দেখতে পাবে, সেটাই হল চামটা। সে দ্বীপটা বাঁ দিকে রেখে কিছুটা চলার পর ডান পাশে শুরু হবে হলদি দ্বীপ। এই দুই দ্বীপের মাঝ দিয়ে চলার পর নদী যেখানে হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা খাঁড়ি এসে মিশেছে। সেই খাঁড়ির চরে বাজ পড়ে পুড়ে যাওয়া পাতাবিহীন বিরাট শিমুল গাছ আছে একটা। তার দুটো ডাল মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে যেন আকাশকে ধরতে চাইছে। সেই গাছের তলায় আগামী ১০ তারিখ সারাদিন তোমার

BanglaBook.org

প্রতীক্ষায় থাকব আমি। আশা করি তোমার দেখা পাব। মনে রেখো, তোমার আসার উপর আমার সারাজীবনের সাধনার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে আছে।

ইতি,

আশীর্বাদক

নীলকান্ত সোম

'পুনশ্চ: চামটায় আসার জন্য সরকারি অনুমতি নিতে যেও না। তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। তোমাকে সরকারি নিয়ম ভাঙতে হবে ঠিকই, কিন্তু তার পিছনে রইল বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য। মাঝিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিলে তারা তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। আমার চিঠি বা তোমার আসার খবর কেউ যেন জানতে না পারে। চিঠি পড়া শেষ হলে এ চিঠি পুড়িয়ে ফেলবে তুমি। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে একাজ বিশেষ দরকার।'

প্রফেসরের চিঠি সন্দীপকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে চামটার উদ্দেশে। মাঝিদের সেখানে যেতে রাজি করাতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সন্দীপকে। একে তো সেখানে যাওয়ার সরকারি অনুমতি নেই, ধরা পড়লে জেল জরিমানা হয়তো আছেই। তবে সবচেয়ে বড় ভয় হল বাঘের। সন্দীপকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে রফা করতে হয়েছে মাঝিদের সঙ্গে। তবে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, খাঁড়ির ভেতর নৌকো নিয়ে যাবে না। আর বনের মাটিতে নামার তো কোনো প্রশ্নই নেই। তারা আরও বলেছে, কোনো অবস্থায়ই এক ঘণ্টার বেশি সেখানে অপেক্ষা করবে না।

এক সময় ওই কালো বিন্দু কাছে এগিয়ে এল। নদীর বাঁ দিকে শুরু হল চামটার ঘন জঙ্গল। আস্তে আস্তে কমে এল মাঝিদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা। আরও কিছুটা এগোবার পর ডানদিকে শুরু হল হলদির জঙ্গল। মাঝিদের আগেই পথ বুঝিয়ে দিয়েছে সন্দীপ। ঠিক পথেই এগোচ্ছে তারা। যত তারা এগোচ্ছে, সন্দীপের উত্তেজনা ততই বেড়ে চলেছে। প্রফেসরের সঙ্গে তার দেখা ঠিক হবে তো! হলদির জঙ্গল শুরু হতেই একদম কর্তা বন্ধ করে দিল তারা। নদী ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। দু-পাশের ঘন জঙ্গলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে শুধু ছপ ছপ শব্দে দাঁড় বইতে লাগল দু-জন। বেলা দেড়টা নাগাদ নৌকো এসে পৌঁছল বাঁকের মুখে। সন্দীপের চোখে পড়ল সেই খাঁড়ি আর প্রফেসরের চিঠিতে লেখা সেই শিমুল গাছ। খাঁড়ির একটু ভেতর দিকে নির্জন চরে একলা দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। সত্যিই যেন সে হাতের মতো দুটো ডাল দু-পাশে মাথার উপর তুলে আকাশকে ধরতে চাইছে। কিন্তু গাছের তলায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। শুধু গাছের একটা ডালে বসে আছে পাটকিলে রঙের বিরাট একটা চিল জাতীয় পাখি। প্রফেসরকে না দেখতে পেলেও গাছটাকে দেখতে পেয়ে সন্দীপের মনে আশা-নিরাশার দোলাটা অনেকখানি কেটে গেল।

BanglaBook.org

তার মনে হল, সবই যখন মিলে গেল তখন নিশ্চয়ই প্রফেসর কাছে কোথাও আছেন। মাঝিরা তাদের কথা মতো নৌকো খাঁড়িতে নিয়ে গেল না। খাঁড়ির মুখে নৌকো নোঙর করল। তাদের একজন একটা লম্বা ধারালো দা খোলের ভেতর থেকে টেনে বের করে হাতের কাছে রাখল। সন্দীপ বুঝতে পারল, সেটা বাঘের জন্য, তার জন্য নয়। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। দিনের আলো সেখানে পৌঁছয় না। চারিদিকে কেমন যেন একটা গা ছমছমে পরিবেশ। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। একজন মাঝি চাপা গলায় সন্দীপকে বলল, "জায়গা মোটেই ভালো নয় বাবু। এখানে বড় কুমির আছে। ওই দেখুন, খাঁড়ির চরের কাদা মাটিতে তার বুক ঘষটে জলে নেমে যাওয়ার লম্বা লম্বা দাগ দেখা যাচ্ছে।"

সন্দীপ তার কথার কোনো উত্তর দিল না। একবার শুধু দাগগুলো দেখে নিয়ে তারপরেই তাকিয়ে থাকল শিমুল গাছটির দিকে। তার হাতের ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে শুরু করল।

২

সময় আস্তে আস্তে গড়িয়ে যেতে লাগল, কিন্তু প্রফেসরের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝি দু-জনের মুখ-চোখ দেখে সন্দীপ বুঝতে পারল, ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠেছে তারা। প্রফেসর কি তাহলে দিনটার কথা ভুলে গেলেন! আবার আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করল সন্দীপের মনে। প্রায় এক ঘণ্টা সময় কেটে যাওয়ার পর একজন মাঝি সন্দীপকে বলল, "এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে না বাবু, নিশ্চয় আপনাকে কেউ ঠকিয়েছে, আর এখানে দাঁড়ানো যাবে না। এবার ফিরতে হবে।"

এই বলে সে নৌকোর নোঙর তোলার জন্য হাত বাড়াল। ঠিক তখনই শিমুল গাছের ডাল থেকে ডানা ঝটপট করে আকাশের দিকে উড়ে গেল পাখিটা। আর তারপরই পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শিমুল গাছের তলায় এসে দাঁড়াল একজন লোক। লোকটি বেশ লম্বা, পরনে খাকি পোশাক, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সন্দীপ চিনতে পারল তাকে। হ্যাঁ, তিনিই প্রফেসর সোম! তিনি একবার দূর থেকে হাত নাড়ালেন সন্দীপের উদ্দেশে। সন্দীপও হাত নাড়াল। এরপর, তিনি শিমুল গাছের কাছে ঝোপের ভেতর থেকে একটা ছোট ডিঙি বের করে জলে নামালেন। তারপর নৌকো নিয়ে খাঁড়ির জল কেটে এগিয়ে আসতে লাগলেন সন্দীপের দিকে। মাঝি দু-জন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে তাকে দেখতে পেয়ে। সন্দীপের কাছেই যে মাঝিটি বসেছিল, সে দু-বার বলে উঠল, "রাম রাম।"

সন্দীপ বুঝতে পারল প্রোফেসর সোমকে দেখে ঠিক মানুষ বলে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। প্রফেসর সোমের নৌকো এসে দাঁড়াল সন্দীপের নৌকোর পাশে। প্রফেসর সোম সন্দীপের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আমি জানতাম তুমি আসবে। এসো, এবার আমার নৌকোয় উঠে পড়ো।"

BanglaBook.org

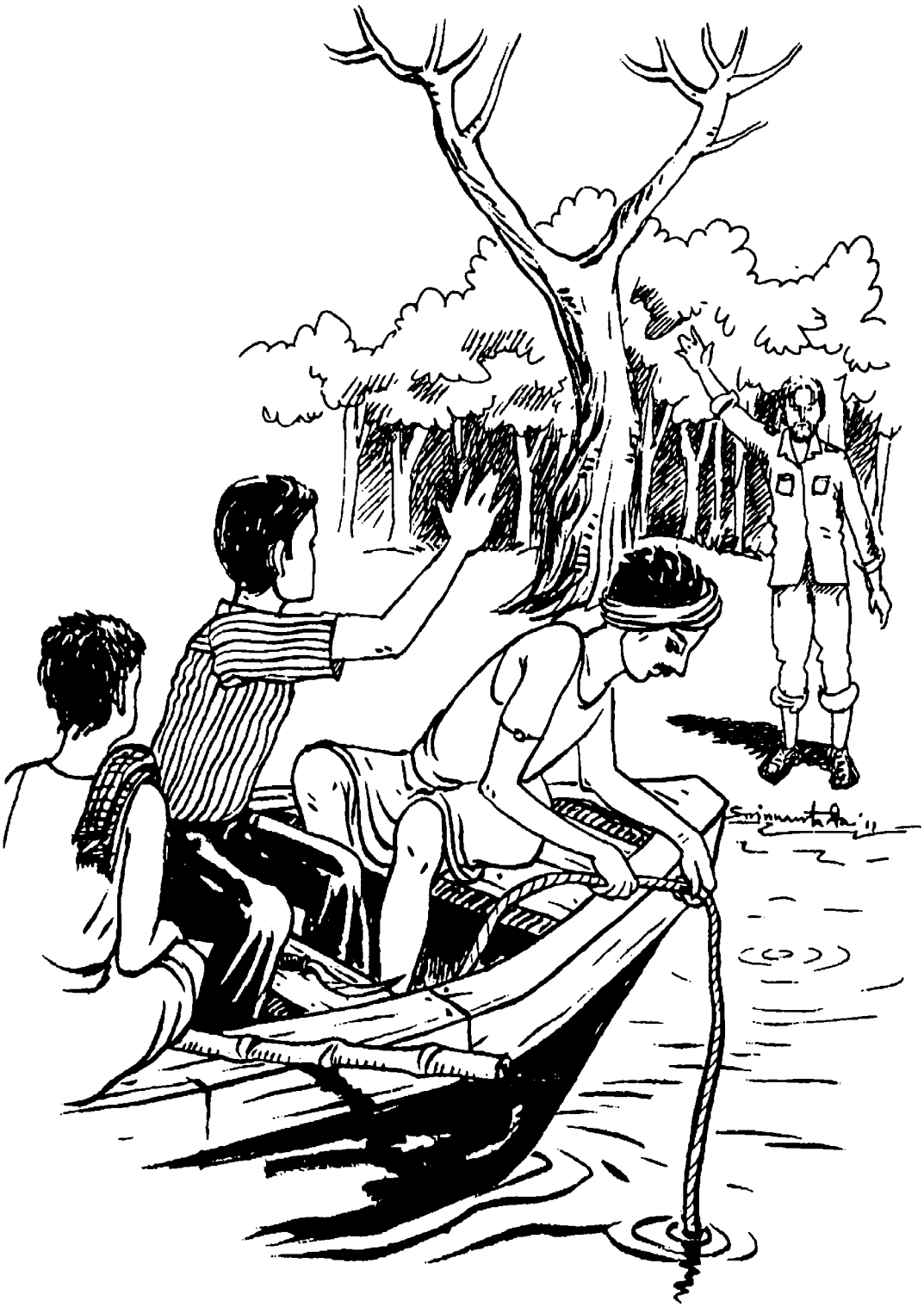

সন্দীপ তার ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে উঠে পড়ল প্রফেসরের নৌকায়। মাঝিরা যেন এই মুহূর্তের প্রতীক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা নোঙর তুলে নিল, তারপর নৌকোর মুখ ফিরিয়ে একবারের জন্যও পিছনের দিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে দাঁড় বইতে শুরু করল। সন্দীপ প্রফেসরের নৌকোয় ওঠার পর প্রফেসর তাকে বললেন, বসে পড়ো, খাঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা পথ আমাদের যেতে হবে।"

নৌকোয় বসার পর সন্দীপ প্রশ্ন করল, "আপনি কেমন আছেন স্যার?"

"ভালো।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে প্রফেসর দাঁড় বইতে শুরু করলেন।

সন্দীপ এবার ভালো করে তাকাল প্রফেসরের দিকে। তার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গৌরবর্ণ শরীর রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। মেদ ঝরে গিয়েছে, দড়ির মতো পাকানো ধমনী ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাহু থেকে। সারা শরীরে কেমন যেন একটা রুক্ষ্মভাব। শুধু একই রকম আছে ভূর নীচে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটো। সন্দীপ ভেবেছিল অনেকদিন পর দেখা হয়েছে, প্রফেসর বুঝি তাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু প্রফেসর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। আপনমনে দাঁড় বাইতে লাগলেন। সাপের মতো একেবেঁকে চলেছে গহিন খাঁড়ি। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। সূর্যের আলো আসে না সেখানে। চারপাশে কেমন ছমছমে পরিবেশ। একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। যেন কোনো অজানা আতঙ্ক থমকে আছে চারদিকে। বেশ ভয় ভয় করতে লাগল সন্দীপের। মাঝে মাঝে খাঁড়ি এত সংকীর্ণ যে, জলের ওপর ঝুঁকে পড়া গাছগুলোকে নৌকোয় দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কে জানে কোনো ডোরাকাটা প্রাণী জঙ্গলের আড়াল থেকে সন্দীপকে দেখে জিভ চাটছে কিনা। আধ ঘণ্টা মতো নিঝুম খাঁড়ি বেয়ে চলার পর একটা বাকের মুখে যেখানে অন্য একটা খাঁড়িএসে মিশেছে, সেখানে এসে খাঁড়ি, চরে নৌকো ভেড়ালেন প্রফেসর। তারপর লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে সন্দীপের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "নেমে পড়ো, আমরা এসে গিয়েছি।"

সন্দীপ তার হাতটা ধরল। তারপর ব্যাগ নিয়ে লাফিয়ে নামল কাদামাটিতে। সন্দীপের মনে হল প্রফেসরের হাতটা যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। তার গা থেকে একটা তীব্র আঁশটে গন্ধও পেল সন্দীপ। মনে হল তিনি অনেকদিন স্নান করেননি। সন্দীপ নীচে নামার পর প্রফেসর নৌকোটাকে টেনে চরে তুলে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। তারপর সন্দীপকে বললেন,"সাবধানে হাঁটো, কাদামাটি খুব পিছল।" এই বলে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন বনের দিকে। কাদায় বসে যাচ্ছে সন্দীপের পা। অতিকষ্টে সে প্রফেসরের পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার ঠিক মুখটায় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রফেসর। তারপর জামার তলা থেকে একটা লম্বা রিভলবার টেনে বের করলেন। সন্দীপ খুব আশ্চর্য হয়ে গেল প্রফেসরের হাতের জিনিসটা দেখে। প্রফেসর এরপর সন্দীপকে বললেন, "কোনো কথা বলো না, এখানে জলের চেয়ে ডাঙায় ভয় বেশি।"

BanglaBook.org

এই বলে তিনি রিভলবারটা বাগিয়ে শুঁড়িপথ ধরে জঙ্গলে ঢুকলেন। সন্দীপ অনুসরণ করল তাকে। দু-পাশে নিবিড় জঙ্গল। দিনেরবেলাতেও ঝিঁঝিঁপোকারা ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন তিনি। আর তার পিছন পিছন সন্দীপ। অন্য কোনো শব্দ কানে গেলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন তিনি। কান খাড়া করে শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করছেন, তারপর আবার এগোচ্ছেন। মিনিট কুড়ি এভাবে চলার পর এক সময় সন্দীপের চোখের সামনে ফুটে উঠল জঙ্গলের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা। আর সেই জমির ঠিক মাঝখানেই মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে শালকাঠের খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরোনো বাংলো ধরনের বাড়ি। বাড়ির তিন পাশের ফাঁকা জমি উঁচু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। আর বাড়ির পিছনে কিছুটা ফাঁকা জমির পর রয়েছে একটা বাড়ি। জালের কাছে এসে একটা দরজা মতো জায়গা দিয়ে জালের ভেতরে সন্দীপকে নিয়ে ঢুকলেন প্রফেসর। তারপর তিনি সন্দীপকে বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, "এই আমার থাকার জায়গা।"

সন্দীপ প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল,"এত গভীর জঙ্গলে বাড়িটা কে তৈরি করেছিলেন?"

বাড়িটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে প্রফেসর বললেন, "ব্রিটিশ আমলে একবার হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবন অঞ্চলে এসেছিলেন জমি জরিপের কাজেই। সেই সময় সুন্দরবনের বেশ কয়েকটা জঙ্গলে এরকম বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবার বনদপ্তর তাদের কাজে বাড়িটা ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল। বিভিন্ন সময়ে কিছু লোকজনকেও এখানে থাকার জন্য পাঠিয়েছিল তারা। কিন্তু বাঘের জ্বালায় কেউই বেশিদিন এখানে টিকতে পারেনি। তাদের অর্ধেক বাঘের পেটে যায়। শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে বাড়িটা। বনদপ্তরের লোকও এর অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছে।"

সন্দীপ তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে বলল,"তাহলে আপনি আছেন কী করে?"

প্রফেসর তার কথা শুনে বললেন, "কিছুটা বুদ্ধির জোরে আর কিছুটা বরাত জোরে।"

প্রফেসরের সঙ্গে ফাঁকা জমি পেরিয়ে সন্দীপ এসে দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। কাঠের বাড়িটার চারপাশ ঘিরে রয়েছে কোমর সমান উঁচু কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। বারান্দা পার হয়ে তবে ঘরে ঢুকতে হয়। মাটি থেকে বারান্দা আর ঘরগুলোর উচ্চতা অন্তত আট ফুট হবে। মাটি থেকে ওপরে ওঠার জন্য কোনো সিঁড়ি নেই। বারান্দা থেকে ঢালু চওড়া একটা কাঠের পাটাতন নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত। প্রফেসর সেই ঢালু পাটাতন বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন। পাটাতন বেয়ে ওপরে উঠতে সন্দীপের একটু ভয় করছিল। তার মনের কথা বুঝতে পেয়ে প্রফেসর বললেন, "প্রথম প্রথম উঠতে নামতে একটু অসুবিধা হবে। পরে ঠিক হয়ে যাবে।"

ধীরে ধীরে সাবধানে কাঠের পাটাতন বেয়ে বারান্দায় উঠে এল সন্দীপ। বারান্দার মেঝেটা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ধরনের। কাদামাটি মাখানো আছে কাঠের মেঝেয়। ওপরে

BanglaBook.org

ওঠার পর সামনেই যে ঘরটা পড়ল তার দরজা খুলে সন্দীপকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন প্রফেসর। ভেতরে ঢুকে প্রফেসর দরজার ঠিক উলটো দিকের একটা জানলা খুলে দিলেন। পশ্চিমের সূর্যের আলো এসে ঢুকল ঘরের ভেতর। সন্দীপ তাকাল ঘরের চারিদিকে। ঘরের এক পাশে রাখা আছে একটা কাঠের চৌকি মতো শোওয়ার জায়গা। তার ওপর একটা কম্বল রাখা আছে। জানলার কাছে আছে অপটু হাতে তৈরি একটা টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপর বিরাট একছড়া কলা আর কিছু ফলমূল রাখা আছে। তার পাশেই এক গোছা মোম আর একটা দেশলাই। একটা জলের কুঁজোও টেবিলের নীচে চোখে পড়ল সন্দীপের। প্রফেসর সন্দীপকে বললেন, "এ ঘরেই থাকতে হবে তোমাকে। এটা এবাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘর।" সন্দীপ প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করল,"আপনার ঘর কোনটা?"

প্রফেসর বললেন,"এ বাড়িতে পাশাপাশি চারটে ঘর। তোমার পাশেরটা হল আমার ভাঁড়ার ঘর। আর সবশেষে বারান্দার শেষ প্রান্তে আমার ল্যাবরেটরি।" এরপর তিনি সন্দীপকে বললেন,"সারাদিন তোমার খুব ধকল গিয়েছে। খাবার, মানে ফল আর জল রাখা আছে। তুমি বরং খেয়েদেয়ে এখন বিশ্রাম নাও। আমি পরে আসব তোমার এখানে। তখন কথা হবে।" এরপর প্রফেসর বললেন, "ঘরের দরজা সব সময় বন্ধ করে রাখবে। আর সন্ধে নামার আগে জানলাটাও বন্ধ করে দেবে। জায়গাটা তো ভালো নয়! তাই এই সতর্কতা দরকার।" সন্দীপ তার কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল,"আচ্ছা।"

প্রফেসর বেরিয়ে যাওয়ার পর সন্দীপ দরজাটা বন্ধ করে দাঁড়াল জানলার ধারে। জানলার ওপাশে, রেলিং ঘেরা বারান্দা। তারপর নীচে কিছুটা ফাঁকা জমি খাঁড়ির পারে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওপারে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে জঙ্গলের মাথায়। বাতাসে গাছের পাতা মৃদু নড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল সন্দীপ। হঠাৎ তার খুব খিদে পেয়ে গেল। জানলা ছেড়ে এসে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। কিছুক্ষণ পর ফল আর জল খেয়ে জানলা বন্ধ করে চৌকিতে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল প্রফেসর একী এমন গবেষণা করছেন যে তার জন্য তাঁকে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কাটাতে হচ্ছে! ভাবতে ভাবতে তার চোখে ঘুম নেমে এল। বাইরে জঙ্গলের বুকে তখন রাত নেমে আসছে।

প্রফেসরের ডাকে ঘুম ভেঙে সন্দীপ যখন অন্ধকার ঘরে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তখন ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে একটা মোম জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। সন্দীপ বসল চৌকিতে। কয়েক মুহূর্তে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে থাকার পর প্রফেসর বললেন, "তুমি যে এখানে আসছ সে খবরটা কালকেই পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।"

সন্দীপ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "কীভাবে পেলেন?"

BanglaBook.org

প্রফেসর বললেন, "কাল তোমাকে আমি চোরাগাজি খালের ওখানে লঞ্চে দেখেছি।"

জায়গাটার নাম গতকালই লঞ্চের মাঝিদের কাছে শুনেছে সন্দীপ। গতকাল লঞ্চে যখন সে নেতিধোপানি থেকে আসছিল, তখন নদীর চরে এক জায়গায় বড় একটা কুমিরকে রোদ পোহাতে দেখেছিল। মাঝিদের কাছে জায়গাটার নাম জানতে চাওয়ায় তারা বলেছিল "জায়গাটার নাম চোরাগাজি খাল।"

সন্দীপ প্রফেসরের কথা শুনে বলল, "দেখলেন যখন তখন ডাকলেন না কেন! তাহলে আপনার সাথেই চলে আসতাম।"

প্রফেসর মৃদু হেসে বললেন,"ডাকিনি, কারণ তা সম্ভব ছিল না বলে।" এরপর প্রফেসর চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে। সন্দীপকে বললেন, "দ্যাখো সন্দীপ, আমার গবেষণা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার জন্য একটা শেষ পরীক্ষা বাকি আছে আমার। সে কাজের জন্য তোমার সাহায্য আমার দরকার। তবে কী সাহায্য লাগবে তা আমি সময়মতো বলব। তবে এটুকু শুধু বলি যথাসম্ভব দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি। গবেষণার জন্য বিশেষ একটা জিনিস জোগাড় করা শুধু বাকি আছে। তা জোগাড় করতে পারলেই দ্রুত কাজ শেষ করব। আর তার জন্য হয়তো কয়েকটা দিন তোমাকে এখানে কাটাতে হবে। আশা করি এ ব্যাপারে তুমি সাহায্য করবে।"

তাঁর কথা শুনে সন্দীপ বলল, "আপনি আমার জন্য কত করেছেন। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

তার কথা শুনে প্রফেসর হেসে বললেন,"না না, ধন্য মনে করার কিছু নেই। মানুষই তো মানুষকে সাহায্য করে। এরপর প্রফেসর বললেন, "এবার তোমাকে কয়েকটি কথা বলব, সেগুলো খেয়াল রাখলে বিপদের আশঙ্কা কমবে তোমার। প্রথমত, সন্ধে নামার পর থেকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা জানলা বন্ধ করে রাখবে। কোনো অবস্থাতেই রাতে ঘরের বাইরে বেরোবে না। দ্বিতীয়ত, কখনও একটানা বারান্দার নীচে জমিতে বেশিক্ষণ থাকবে না। ভোরবেলা আর সন্ধে নামার আগে সতর্ক থাকবে। ওই সময় বাঘেরা জল খেতে আসে। তৃতীয়ত, খাঁড়ির পারে বা ওদিকের জমিতে কখনো বেড়াতে যাবে না। জাল নেই বলে ওদিকটা খুব বিপজ্জনক।" এই কথাগুলো বলার পর প্রফেসর বললেন, "একদিন আমাকে কাজের জন্য বেশি সময় ল্যাবরেটরিতে কাটাতে হবে। তোমাকে একলা এখানে রেখে বাইরেও যেতে হতে পারে। তোমাকে হয়তো আমি খুব বেশি সঙ্গ দিতে পারব না। ব্যাপারটা মানিয়ে নিও তুমি। এরপর প্রফেসর সন্দীপের কাছ থেকে কলকাতার সম্বন্ধে কিছু মামুলি খোঁজখবর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রফেসর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে পোশাক পালটে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সন্দীপ। সারাদিনের ক্লান্তিতে তার চোখে ঘুম নেমে এল। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙে

BanglaBook.org

গেল সন্দীপের। বাইরে মনে হল মেঘ ডাকছে। তবে কি বৃষ্টি নামবে! আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল সন্দীপ।

৩

সন্দীপের যখন ঘুম ভাঙল তখন সাতটা বেজে গিয়েছে। ঘরের ছাদের ওপর একটা গোল ফোকর আছে। সেখান দিয়ে আলো এসে পড়েছে তার বিছানার পাশে। এখানে আজ তার প্রথম সকাল। চৌকি থেকে নীচে নেমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সন্দীপ। সুন্দর সকাল। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সামনের ফাঁকা জমিতে। কিছু দূরে লোহার জালের ওপাশে জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে পাখির ডাক। সন্দীপ চারপাশে তাকিয়ে প্রফেসরকে দেখতে পেল না। ঘরে ফিরে জানলাটা খুলে দিল। এবার সে দেখতে পেল প্রফেসরকে। বারান্দা থেকে একটু দূরে ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছেন। তাকে দেখতে পেয়ে সন্দীপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। প্রফেসর তাকালেন বারান্দার দিকে। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে তিনি দূর থেকে চিৎকার করে বললেন, "গুডমর্নিং সন্দীপ। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?" সন্দীপ বলল, "হ্যাঁ।" তারপর সে বলল, "আমি ওখানে যাব স্যার?"

প্রফেসর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন তার কথা শুনে। সন্দীপ বারান্দার এপাশে ফিরে এসে সাবধানে কাঠের পাটাতন বেয়ে প্রথমে নীচে নামল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়াল খাঁড়ির দিকের জমিতে প্রফেসরের কাছে। জমিতে কোনো ঘাস নেই। মাটি যেন কেমন ভেজা ভেজা। তা দেখে সন্দীপ প্রফেসরের কাছে গিয়ে বলল,"কাল রাতে কি বৃষ্টি হয়েছিল? রাতে যেন মেঘের ডাক শুনেছিলাম?"

তার কথা শুনে প্রফেসর বললেন, "কই না তো! কাল সারারাত তো আমি ল্যাবরেটরিতে জেগেই কাটিয়েছি।" পরমুহূর্তেই প্রফেসর বললেন, "ও, বুঝতে পেরেছি। তুমি যেটা মেঘের ডাক বলে ভেবেছ তা আসলে বাঘের গর্জন।"

সন্দীপ অবাক হয়ে বলল,"বাঘের গর্জন?"

প্রফেসর উত্তর দিলেন,"হ্যাঁ।"

এই বলে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন সামনের মাটির দিকে। সন্দীপ দেখল কাদামাটিতে আঁকা হয়ে গিয়েছে বাঘের পায়ের ছাপ। সেগুলো এগিয়ে গিয়েছে খাঁড়ির দিকে। ছাপগুলো দেখতে দেখতে সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল,"বাঘটা কত বড়?"

প্রফেসর বললেন,"সুন্দরবনের বাঘ সাধারণত দশ থেকে বারো ফুটের মতো হয়। আমার অনুমান এটা ন থেকে দশ ফুট মতো হবে। তবে এটা বাঘ নয়, বাঘিনী। ভালো করে মাটিটা দ্যাখো।"

BanglaBook.org

সন্দীপ ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেল বড় ছাপগুলোর পাশে অস্পষ্ট ছোট ছোট কয়েকটি ছাপ আঁকা আছে। সঙ্গে বাচ্চা আছে তার। প্রফেসর এবার বললেন, "বাচ্চাটার পায়ের ছাপটা না থাকলেও ও বাঘ না বাঘিনী আমি বুঝতে পারতাম।"

সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল,"কীভাবে?"

প্রফেসর বললেন,"অভিজ্ঞতা থেকে।" তারপর বক্তৃতার ঢঙে বলতে শুরু করলেন, বাঘ যখন হাঁটে তখন বাঘের চার আঙুলের ছাপ মাটিতে পড়ে। পঞ্চম আঙুলের ছাপ মাটিতে পড়ে না। বাঘের পায়ের ছাপকে বলে 'খোঁচ'। খোঁচ দেখে বাঘ চেনা যায়। বাঘিনীর খোঁচের চারদিকে কল্পিত রেখা টেনে চতুর্ভুজ অঙ্কন করলে তা হয় আয়তাকার। আর বাঘের ক্ষেত্রে হয় বর্গাকার। এরকম বেশ কিছু পার্থক্য আছে খোঁচের মধ্যে। তবে ছ-মাস বয়স না হলে খোঁচ দেখে বাঘ না বাঘিনী চেনা যায় না। যেমন এই বাচ্চাটা বাঘ না বাঘিনী চেনা সম্ভব নয়। কারণ এর বয়স সম্ভবত মাস দুয়েকের বেশি নয়।" এই বলে থেমে গেলেন প্রফেসর। সন্দীপ অবাক হয়ে শুনল তার কথা। তিনি সন্দীপকে বললেন,"চলো, এবার ওপরে যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে আছি। কে জানে খাঁড়ির ওধারের জঙ্গল থেকে কেউ আবার আমাকে দেখছে কিনা!" এই বলে হেসে উঠলেন প্রফেসর, তারপর হাঁটতে শুরু করলেন বাড়িটার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে সন্দীপ প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল,"আচ্ছা, সুন্দরবনের সব বাঘই কি মানুষখেকো?" প্রফেসর বললেন,"হ্যাঁ।"

"কেন?" সন্দীপ ফের জিজ্ঞেস করল।

প্রফেসর বললেন,"বাদা বন বা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রতিকূল পরিবেশে অন্য প্রাণীর মতো বনের রাজাকেও প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়। তাই তার খাদ্যতালিকায় মানুষ থেকে ব্যাং কিছুই বাদ যায় না। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবার নতুন এক তথ্য দিয়েছেন। তারা বলেছেন, খাঁড়ির লোনা জল খাওয়ার ফলে যে নুন বাঘের শরীরে ঢোকে সেই নুন বাঘের শরীরে এক জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া তৈরির করার ফলে বাঘ মানুষখেকো হয়। তারা আরও দেখিয়েছেন যে, মে-জুন মাসে নদীতে জলে নুনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়, তাই এই সময় বাঘ আক্রমণ করে বেশি।" কথা বলতে বলতে প্রফেসর সন্দীপকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন। তারপর তার ঘরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "আমি এখন আবার আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকব। বিকেলের আগে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। একলাই তোমাকে কাটাতে হবে।"

সন্দীপ বলল, "আচ্ছা।"

প্রফেসর এবার বারান্দার ওপাশে চলে গেলেন, সম্ভবত তার ল্যাবরেটরিতে যাওয়ার জন্য।

BanglaBook.org

সারা সকাল-দুপুর বন্ধ ঘরের মধ্যে সঙ্গে আনা একটা বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কেটে গেল সন্দীপের। মাঝে একবার দুপুরবেলা খাবার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। তখন জানলা দিয়ে দেখেছিল দুটো বিরাট চিতল হরিণ জল খেতে এসেছে খাঁড়িতে। জল খাওয়ার পর আবার তারা চলে গেল জঙ্গলে। প্রফেসরেরও আর কোনো সাড়াশব্দ পায়নি সন্দীপ। নিশ্চয়, তিনি ল্যাবরেটরিতে ব্যস্ত রয়েছেন।

বিকেল বেলা ঘর ছেড়ে বাইরে বের হল সন্দীপ। গতকাল এইসময় এখানে এসে হাজির হয়েছিল। একটা দিন কেটে গেল। সারাটা দিন বন্ধ ঘরের মধ্যে কেটেছে। সে ভাবল, নীচে নেমে একটু হেঁটে আসা যাক। এই ভেবে সে ধীরে ধীরে নীচে নেমে হাঁটতে শুরু করল জালে ঘেরা জমিটার দক্ষিণ দিকে। কিছুদূর এগোবার পর সে বুঝতে পারল ওদিকে একটা ছোট পুকুর মতো আছে। হাঁটতে হাঁটতে সে গিয়ে হাজির হল সেখানে। দেখল, পুকুরের পারে খেলে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েকটা তারখেল বা সর্দার গোসাপ। এই প্রাণীগুলোর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল সন্দীপের। প্রফেসরের কলকাতার ল্যাবরেটরির খাঁচায় বেশ কয়েকটা এই প্রাণী ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়ার আগে কী কারণে যেন মারা যায় প্রাণীগুলি। এদের বৈজ্ঞানিক নামটাও মনে পড়ে গেল তার, 'ভেরেনাস সালভেটর'। এই নামটা অবশ্য প্রফেসরের মুখ থেকেই শুনেছিল সে। আরও শুনেছিল, এই প্রাণী নাকি সুন্দরবনের সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে কি এদের নিয়ে গবেষণা করার জন্যই তিনি সুন্দরবনে এসেছেন! মনে মনে একবার ভাবল সন্দীপ। প্রাণীগুলো সন্দীপকে দেখে একবার ঘাড় উঁচু করল, তারপর আবার নিজেদের মনে খেলে বেড়াতে লাগল। কাছেই মাটিতে একটা কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে। সন্দীপ গিয়ে বসল তার ওপর। তারপর তারখেলগুলোর খেলা দেখতে লাগল। পুকুরের ওপাশে জালের ওপারে জঙ্গলের ভেতর থেকে কী যেন একটা পাখি কিটকিট শব্দ করে মাঝে মাঝে ডাকছে।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সন্ধে নামবে। নিস্তব্ধ হয়ে যাবে অরণ্য। শ্বাপদরা বের হবে শিকার ধরার জন্য। সন্দীপ বসে বসে ভাবতে লাগল, এই জনমানবহীন ভয়ংকর পরিবেশে কি করে এত দিন কাটাচ্ছেন প্রফেসর। এ তো আর সুন্দরবনে বেড়াতে এসে লঞ্চে বসে দূর থেকে নদীর চরে হরিণ দেখা বা কুমির দেখা নয়। এ হল আসল সুন্দরবন। দিনে-রাতে যখন-তখন বাঘ বেড়াতে আসে এখানে। সত্যিই প্রফেসরের অসীম সাহস।

মিনিট কুড়ি বসার পর সন্দীপ ভাবল, এবার ফেরা উচিত। প্রফেসর তাকে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ নীচে থাকতে বারণ করেছেন। সন্দীপ উঠে দাঁড়াতে যাবে, ঠিক এই সময় তারখেলগুলো হঠাৎ ঘাড় উঁচু করে কী যেন দেখল। আর তারপরই যে যেখানে ছিল ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরের জলে। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ টের পেল একটা আঁশটে গন্ধ। সন্দীপ পিছন ফিরে দেখল কখন যেন নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর

BanglaBook.org

সোম। সন্দীপ উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে। প্রফেসরের দৃষ্টি পুকুরটার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এই প্রাণীগুলো হয়তো একদিন পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবে।" সন্দীপ প্রফেসরের কথা শুনে কিছু বুঝতে না পেরে বলল, "কেন?"

তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সময় হলে জানতে পারবে।" এরপর আর তারখেলের প্রসঙ্গে কোনো কথা বললেন না তিনি। সন্দীপকে বললেন, "আজ বন্ধ ঘরে একা একা সময় কাটাতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে? কাল তোমায় আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব।" সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব আমরা?"

প্রফেসর বললেন, "আমরা যাব গোয়াসাবা দ্বীপের কাছে।"

সন্দীপ বলল,"গোসাবা? সে তো সজনেখালি আসার পথে!"

প্রফেসর তার কথা শুধরে দিয়ে বললেন,"না, গোসাবা নয়, গোয়াসাবা। গোয়াসাবা দ্বীপ হলদির একদম দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের গায়ে। ভঙ্গদুয়ানি আর গোসাবা নদী মিলেছে দ্বীপটার কাছে। তুমি হয়তো মায়া দ্বীপের নাম শুনেছ। ভঙ্গদুয়ানি ধরে দক্ষিণে এগোলেই মায়াদ্বীপে পৌঁছনো যায়।"

সন্দীপ প্রফেসরের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে আপনি কী করতে যাবেন?"

প্রফেসর সোম উত্তর দিলেন, "গেলেই দেখতে পাবে।" তারপর বললেন, "এবার ফিরে চলো। একটু পরেই সন্ধ্যা নামতে শুরু করবে। সময়টা ভালো নয়।"

দু-জনেই এবার ফিরতে শুরু করল বাড়িটার দিকে। বারান্দায় ওঠার পর সন্দীপ আবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। আর প্রফেসর চলে গেলেন তাঁর নিজের কাজে।

ঘরের ভেতর আলো কমে এসেছিল। তাই ঘরে ঢোকার পর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসা বইটা চৌকিতে বসে পড়তে শুরু করল সন্দীপ। বইটা ইংরেজি রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসের সংকলন। সন্দীপ পড়তে শুরু করল স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড'। জীববিজ্ঞানের এক অধ্যাপক সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূরে এক পার্বত্য বনাঞ্চলের সন্ধান পেয়েছিলেন। লক্ষ কোটি বছর আগের এক হারানো পৃথিবীর। যেখানে ঘুরে বেড়ায় ভয়ংকর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা। সেখানকার অভিযানের কাহিনী নিয়েই এই রোমাঞ্চকর উপন্যাস। সন্দীপ পড়তে পড়তে গল্পটার মধ্যে এতটাই ডুবে গেল যে বাইরে কখন অন্ধকার নামল সে বুঝতে পারল না। রাত আটটা নাগাদ তার পড়া শেষ হল। বাতিটাও জ্বলে নিভু নিভু হয়ে এসেছে। হঠাৎ সে খেয়াল করল জানলাটা বন্ধ করা হয়নি। প্রফেসর তাকে সন্ধের পর জানলা-দরজা বন্ধ করে রাখতে বলেছেন। নিজের অসতর্কতায় মনে মনে লজ্জা পেয়ে বই রেখে উঠে গেল জানলার কাছে সেটা বন্ধ করার জন্য। জানলা বন্ধ করার আগে বাইরের দিকে তাকাল সন্দীপ। ক-দিন পরই মনে হয় পূর্ণিমা। বেশ বড় চাঁদ আকাশে। চাঁদের আলোয় বারান্দার নীচের জমিটা, খাঁড়ির

BanglaBook.org

পার আর তার ওপাশের জঙ্গলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাম না জানা বনফুলের গন্ধ ভেসে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে। হঠাৎ সন্দীপের চোখে পড়ল, বারান্দার নীচের জমিতে একটা লম্বা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। ওটা তো এর আগে এখানে দ্যাখেনি! সন্দীপ ভালো করে তাকাল সেদিকে, ঠিক তখনই যেন নড়ে উঠে চলতে শুরু করল গুঁড়িটা। সন্দীপ এবার বুঝতে পারল সেটা আসলে গাছের গুঁড়ি নয়, বড় একটা কুমির। প্রাণীটা বুকে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল খাঁড়ির পারে। তারপর বাড়িটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বড় একটা হাঁ করল। দূর থেকে হলেও চাঁদের আলোয় সন্দীপ স্পষ্ট দেখতে পেল তার চোয়ালের সাজানো দাঁতগুলো। তা দেখে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েও শিউরে উঠল সন্দীপ। তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল প্রাণীটা। একটা মৃদু শব্দের সঙ্গে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল খাঁড়ির জল। সন্দীপ বুঝতে পারল খাঁড়িতে ঝাঁপ দিল প্রাণীটা। ঘরের মোমটা দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। সন্দীপ তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে আরেকটা মোম জ্বালিয়ে নিল। তারপর চৌকিতে বসে ভাবতে লাগল, সত্যিই এক ভয়ংকর জায়গায় রাত কাটাচ্ছে সে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সন্দীপের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন প্রফেসর। সন্দীপ উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই ঘরের ভেতর ঢুকলেন প্রফেসর। সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খাওয়া হয়েছে তোমার?"

সন্দীপ বলল,"না এখনও হয়নি। মোমের আলোয় সন্দীপ দেখতে পেল প্রফেসরের মাথা ভেজা। জল ঝরছে চুল থেকে। তা দেখে সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার চুল ভিজে কেন? এখন স্নান করলেন নাকি?"

প্রফেসর বললেন, "না, আমি খাঁড়ির পারে একটু আগে গিয়েছিলাম। কাল যাব বলে নৌকোটা ঠিক করে রাখতে। খাঁড়ির জলই ছিটকে মাথায় লেগেছে।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই, সন্দীপ বলল, "সে কী! এতরাতে আপনি ওখানে গিয়েছিলেন! জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই আমি বড় একটা কুমিরকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। তারপর খাঁড়িতে নেমে গেল সেটা।"

প্রফেসর চমকে উঠলেন সন্দীপের কথা শুনে। তারপর কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "কাজটা তুমি ভালো করোনি। সন্ধে নামার পর জানলা-দরজা বন্ধ রাখতে বলেছিলাম তোমাকে। সামান্য অসতর্কতা এখানে তোমার বিপদ ডেকে আনতে পারে। আশা করি ভবিষ্যতে এসব ব্যাপারে সচেতন থাকবে তুমি।"

প্রফেসর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "যে কথাটা বলার জন্য তোমার ঘরে এলাম সেটা এবার বলি। কাল ঠিক সাতটায় আমরা বেরোব। তুমি তৈরি হয়ে নিও।" এই বলে প্রফেসর ঘর ছেড়ে বারান্দায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সন্দীপ স্পষ্ট বুঝতে পারল জানলাটা খোলা ছিল বলে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন

BanglaBook.org

প্রফেসর। শুধু একটা জিনিস সে বুঝতে পারল না যে, খাঁড়ির দিকটা বিপজ্জনক জেনেও এত রাতে তিনি ওখানে গেলেন কেন! কাজটা তো তিনি অন্য সময় করতে পারতেন।

৪

বেলা তখন প্রায় দশটা বাজে। জল কেটে এগিয়ে চলছিল প্রফেসরের নৌকো। আজ ঠিক সকাল সাতটাতেই বেরিয়ে পড়েছে তারা। প্রফেসর সঙ্গে করে মুখ বাঁধা একটা বড় চটের বস্তা এনেছেন। তার ভেতর কী আছে তা অবশ্য সন্দীপ জানে না। প্রফেসরের মনমেজাজ মনে হয় আজ ভালো। দাঁড় বাইতে বাইতে মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইছেন, নিজেই সন্দীপকে এটা-ওটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ঘণ্টা তিনেক বড় গাঙ বেয়ে চলার পর নৌকো ঢুকল খাঁড়ির ভেতর। তার দু-পাশে সুন্দরী গাছের জঙ্গল। সুন্দরীর পাতাগুলো ছোট ছোট। অনেকটা লবঙ্গ পাতার মতো দেখতে। তার ওপরটা মসৃণ আর নীচের অংশ ধূসর রঙের। দাঁড় বাইতে বাইতে প্রফেসর বললেন, "একসময় বনের সব জায়গায় সুন্দরী গাছ দেখা যেত, এখন শুধু বনের দক্ষিণ দিকেই বেশি দেখা যায়।"

খাঁড়ি বেয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল সন্দীপের। খাঁড়ির নির্জন চরে একটা নৌকোর বৈঠা পোঁতা আছে। তার ফলার দিকটা আকাশের দিকে মুখ করা। তার মাথার দিকে রং চটে যাওয়া একটা কাপড়ের ফালি পতাকার মতো উড়ছে। সন্দীপ বলল, "ওটা কী?" প্রফেসর বললেন, "ওর মানে হল এখানে কোনো মানুষকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল। যখন কোনো মাঝিকে বাঘে নিয়ে যায় তখন অন্য মাঝিরা সেই নৌকোর বৈঠা চরে পুঁতে দিয়ে কাপড়ের পুঁটলিতে কিছু চাল বেঁধে দেয় তার সঙ্গে।"

তার কথা শুনে সন্দীপ বলল, "কেন?" প্রফেসর বললেন,"ব্যাপারটা মৃত মানুষের আত্মার শান্তি কামনায় করা হলেও, এর আসল উদ্দেশ্য হল জায়গাটা সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করা।"একটু থেমে প্রফেসর বললেন, "জায়গাটা আসলে সুন্দরবন তো, এখানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, মৃত্যু এখানে পায়ে পায়ে খেলে বেড়ায়। জঙ্গলের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হলে সে ভাষা জানতে হয়।" সন্দীপ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বাঘ আর কুমিরের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর।"

সন্দীপের প্রশ্ন শুনে প্রফেসর একবার ফিরে তাকালেন তার দিকে,"আমার মনে হয় কুমির। বাঘের মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছে এমন মানুষ খুঁজলে তুমি দু-একজন পাবে। কিন্তু কুমিরের চোয়াল থেকে কেউ ফিরে আসে না। সুন্দরবনের কুমির পৃথিবীর বৃহত্তম মোহনার কুমির। জোয়ারের জল অনেক সময় পনেরো-ষোলো ফুট উঁচু হয়ে দ্বীপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাগে পেলে বাঘকেও তারা তখন টেনে নিতে চেষ্টা করে। এমনই শক্তিধর এই প্রাণী।

BanglaBook.org

তার কথা শুনে সন্দীপ বলল,"তাদের চোয়াল কত বড়?"

প্রফেসর দাঁড় বাইতে বাইতে বললেন, "তাহলে তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এর যে নমুনা রাখা আছে আকারে তা তেত্রিশ ফুট। কুড়ি-বাইশ ফুটের কুমির তো হামেশাই চোখে পড়ে সুন্দরবনে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হল, "কোকোডাইলাস পোরোসাস।"

কথা বলতে বলতে প্রফেসরের নৌকা এসে পৌঁছল একটা বড় গাঙে। প্রফেসর সন্দীপকে বললেন,'আর বেশিক্ষণ নয়, আমরা প্রায় এসে গিয়েছি।'

বড় নদী, ডান দিকের চর ঘেঁষে এগোচ্ছেন প্রফেসর। হঠাৎ তিনি সন্দীপকে বললেন, "ওই দ্যাখো!" এই বলে তিনি নৌকাটিকে দ্রুত চরে ভিড়িয়ে দিলেন।

সন্দীপ দেখতে পেল একটু দূরে কাদার চরে গোল পাথরের মতো কী যেন পড়ে আছে। প্রফেসর নৌকো থেকে লাফিয়ে কাদা মাটিতে নামলেন, তারপর জিনিসটা তুলে নিয়ে আবার নৌকোর কাছে ফিরে এলেন। সন্দীপ দেখতে পেল সেটা একটা কচ্ছপ। তবে তার পাগুলো অনেকটা ডানার মতো। প্রফেসর সেটা নিয়ে নৌকোয় উঠতে উঠতে বললেন, "এর নাম অলিভ রিডলে টার্টল। দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মোহনায় ডিম পাড়তে আসে।"

সদীপ বলল, "কী করবেন এটা দিয়ে?" প্রফেসর বললেন, "ওর ফ্লিপার দুটো ভেঙে গিয়েছে। ও আর সমুদ্রে ফিরে যেতে পারবে না। এটা দিয়ে বরং রাতে উদরপূর্তি করা যাবে।" এই বলে আবার দাঁড়টা জলে ফেলবার জন্য তুলে নিলেন প্রফেসর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বড় গাঙ ছেড়ে খাঁড়িতে এলেন প্রফেসর। তারপর এমন একটা জায়গায় এসে তারা হাজির হলেন, সেখানে কোনাকুনিভাবে দুটো খাঁড়ি এসে পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে। ওপাশে ক্যাওড়া আর বাইনের ঘন জঙ্গল। প্রফেসর সেখানে এসে চরে নৌকো ভেড়ালেন না। খাঁড়ির মাঝখানে নৌকো থেকে ছোট্ট নোঙরটা জলে ফেললেন। তারপর কীসের জন্য যেন নৌকোয় বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সময় কাটতে লাগল। সন্দীপ দেখতে পেল জোয়ারের জল আস্তে আস্তে বাড়ছে। চরের মধ্যে জেগে থাকা শুলোগুলো আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে জলের তলায়। প্রফেসরের কপালেও যেন ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কেটে যাওয়ার পর তিনি একসময় স্বগতোক্তি করলেন, "ওরা মনে হয় আজ আসবে না, এবার ফিরতে হবে। নইলে সন্ধের আগে আর পৌঁছনো যাবে না।" এই বলে প্রফেসর হাত বাড়াতে লাগলেন নোঙরের শিকলটার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা কীসের যেন শব্দ শুনতে পেল সন্দীপ। শব্দটা শুনতে পেলেন প্রফেসরও। সন্দীপ দেখল, প্রফেসরের মুখে ফুটে উঠল একটা মৃদু হাসি। শিকলটা আর তুললেন না তিনি। শব্দটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

একসময় সন্দীপ দেখতে পেল মোটর লাগানো একটা দ্রুতগামী নৌকো উলটো দিকের খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। জনাচারেক লোক রয়েছে তার মধ্যে, ওরা কারা? নৌকোটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সন্দীপ। নৌকোটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সন্দীপের নৌকোর ঠিক পাশে। তিনজন যুবক আর একজন মাঝবয়সি লোক রয়েছে তাতে। প্রত্যেকেরই পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। পাশে এসে দাঁড়াবার পর মাঝবয়সি লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের উদ্দেশ্যে বলল, "ছালাম কত্তা।"

প্রফেসরও উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, "আমি তো ভাবলাম তুমি আর এলেই না। এখনই ফিরে যাচ্ছিলাম।" তাঁর কথা শুনে লোকটা বলল, "কী করুম কত্তা! দুই দেশের জলপুলিশের চোখে ধুলো দিয়া আইতে হয়। আজ আবার নৌকোর খোলে বাঘ মারা বন্দুক। ধরা পড়লেই দশডা বছর জ্যাল। অনেক ঘুইরা আইতে হল আজ।" তারপর লোকটি বলল, "আপনি বরং একটা দল গড়ুন কত্তা। আমরা তাতে যোগ দিমু।"

তার কথা শুনে ধমকে উঠলেন প্রফেসর, "বাজে কথা রাখো। এখন আমার জিনিসটা দাও আর তোমাদেরটা নাও।"

লোকটি এবার নৌকোর খোল থেকে বের করে আনল একটা রাইফেল আর একটা ছোট লম্বাটে বাক্স। প্রফেসরের হাতে সেগুলো তুলে দিতে দিতে বলল, "ছাইলেনছর আর গুলি বাক্সর মধ্যে আছে। আমাদের তো এ জিনিস কামে লাগে না। এমনই বোমা-গুলিতেই কাজ চলে যায়।"

প্রফেসর তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে নৌকোর খোলের মধ্যে রাখলেন। তারপর চটের বস্তাটা তুলে নিয়ে লোকটির দিকে এগিয়ে দিলেন। লোকটি বস্তাটা তুলে নিয়ে তার নৌকোর খোলের মধ্যে রেখে বলল, "তাহলে এখন আসি কত্তা? সামনের পাঁচ তারিখ ফের আসুম।"

প্রফেসর উত্তর দিলেন, "আচ্ছা।" তাদের নৌকোর মোটরটা চালুই ছিল। নৌকোর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত আবার ফিরে চলল তারা। প্রফেসরও এরপর নোঙর তুলে নিয়ে দাঁড় ফেললেন জলে।

পুরো ঘটনাটা অবাক হয়ে দেখল সন্দীপ। প্রফেসর ফেরার জন্য দাঁড় বাইতে শুরু করতেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, "ওরা কারা?"

প্রফেসর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওরা জলদস্যু।"

সন্দীপ শুনেছে যে, সুন্দরবন অঞ্চলে জলদস্যুরা মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই করে, নিরীহ ধীবরদের ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে। খবরের কাগজে ছাপা হয় এসব খবর। তাই প্রফেসরের কথা শুনে সে বলল, "ওরা তো ভয়ংকর লোক। মানুষ খুনও করে। ওদের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?"

BanglaBook.org

প্রফেসর দাঁড় বাইতে বাইতে বললেন, "বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার যোগাযোগের ওরাই একমাত্র মাধ্যম। অন্য দেশ থেকে আসে ওরা। ওদের জিনিসপত্র আমার কাছে লুকিয়ে রেখে যায়, পরিবর্তে আমারও কিছু কাজ করে দেয়। তোমার ওই চিঠিটা ওদের মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলাম আমি।"

সন্দীপ বলল, "কিন্তু এসব কাজ তো আইনের চোখে অপরাধ।"

প্রফেসর বললেন, "তা আমি জানি। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাসের জন্য আমি এসব করছি না। আমি যা করছি তার পিছনে বিজ্ঞান সাধনার মহৎ উদ্দেশ্য আছে।"

প্রফেসরের বক্তব্য ঠিক গ্রহণযোগ্য মনে হল না সন্দীপের। সে বলল, "বন্দুক আর সাইলেন্সর দিয়ে কী করবেন আপনি?"

নৌকো চালাতে চালাতে প্রফেসর বললেন, "কাল সকালে যে বাঘের বাচ্চার পায়ে ছাপ দেখেছিলে তাকে আমার অন্তিম গবেষণার জন্য বিশেষ দরকার। কিন্তু বাঘিনী বেঁচে থাকতে সেটা সম্ভব নয়। আমাকে মারতে হবে ওকে। বন্দুকের শব্দ যাতে অন্য কারও কানে না যায়, তার জন্য সাইলেন্সরটা আমার দরকার।" এরপর চুপ করে গেলেন প্রফেসর। সন্দীপও আর কোনো কথা বলল না। নৌকোয় বসে বনের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে সে শুধু ভাবতে লাগল, প্রফেসর কী এমন গবেষণা করছেন যার জন্য এত আইন ভাঙছেন তিনি!

সন্দীপের আশ্চর্য হওয়া বোধ হয় আরও বাকি ছিল। ফেরার সময় আরও অবিশ্বাস্য ঘটনা সন্দীপ দেখল। প্রফেসরের ডেরা আর তখন ঘণ্টা খানেকের পথ। বেলা পড়ে এসেছে। একটা নির্জন চরে হঠাৎ তারা দেখতে পেল, একটা ফুট দুয়েক লম্বা কুমিরের বাচ্চাকে ধরার চেষ্টা করছে একটা শেয়াল। বাচ্চাটাকে খাঁড়ির জলে নামতেও দিচ্ছে না। শুধু তার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে আর তার গায়ে কামড় বসাবার চেষ্টা করছে। ঘটনাটা দেখামাত্রই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন প্রফেসর। নৌকো চরে ভিড়িয়ে বইঠা নিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে তাড়া করলেন শিয়ালটাকে। শিয়ালটা মনে হয় ভাবেনি যে, এই নির্জন চরে কেউ তার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে! তাই সে একবার থমকে তাকাল প্রফেসরের দিকে, তারপর তিনি কাছে পৌঁছতেই সে দৌড় লাগাল চরের পাশে জঙ্গলের ভেতর। কুমিরের বাচ্চাটা কিন্তু পালাল না। প্রফেসর বাচ্চাটিকে মাটি থেকে তুলে নিলেন, তারপর ফিরে আসতে লাগলেন নৌকোর দিকে। সন্দীপ ভাবল এটাকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নাকি!

প্রফেসর এসে দাঁড়ালেন নৌকোর কাছে। ড্যাবড্যাবে চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে প্রফেসরের হাতে ধরা প্রাণীটি। তিনি প্রাণীটি দেখিয়ে সন্দীপকে বললেন, "কী সুন্দর দেখেছ! এত সুন্দর প্রাণী এই বনে আর নেই।"

BanglaBook.org

সন্দীপের কিন্তু মোটেও ভালো লাগল না প্রাণীটিকে। তার শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। হঠাৎ সন্দীপ দেখল নৌকোটা চরে যেখানে ভেড়ানো আছে সেখানে চরের কাদামাটির ওপর লম্বা লম্বা কয়েকটা দাগ। সেগুলো চিনতে পেরে সন্দীপ প্রফেসরকে বলল, "শিগগির নৌকোয় উঠে পড়ুন। জায়গাটা কুমিরের আড্ডা। ওই দেখুন কাদার ওপর কুমিরের দাগ।"

সন্দীপের কথায় প্রফেসর স্মিত হেসে বললেন, "তা আমি জানি। কিন্তু নৌকোয় ওঠার আগে দেখি এর কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।" এই বলে বইঠাটা নৌকোয় ছুড়ে ফেলে প্রফেসর জল থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে বাচ্চাটিকে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে জঙ্গলের দিকে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করতে শুরু করলেন। সন্দীপ বুঝতে পারছিল না কী করতে চাইছেন প্রফেসর। সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তিনি কিন্তু শব্দটা করে যেতেই লাগলেন।

মিনিট কয়েক পর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল সন্দীপ। আর তার পরমুহূর্তেই জঙ্গলের ভেতর থেকে লাফিয়ে চরে নেমে এল প্রকাণ্ড একটা কুমির। সেটা এগোতে শুরু করল প্রফেসরের দিকে। নৌকোয় দাঁড়িয়ে সন্দীপ ভয়ে চিৎকার করতে গেল। কিন্তু তার গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। বিস্ফারিত চোখে সন্দীপ দেখল ঘটনাটি। কুমিরটা কিন্তু প্রফেসরকে আক্রমণ করল না। তাঁর ফুট দশেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তারপর কয়েক মুহূর্ত প্রফেসর আর কুমিরটা যেন পরস্পরকে দেখল, তারপর বাচ্চাটাকে মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল কুমিরটা।

প্রফেসর নৌকোয় এসে ওঠার পর কিছুক্ষণ বিস্ময়ে কোনো কথা বলতে পারল না সন্দীপ। তারপর সে প্রফেসরকে বলল, "কুমিরটা আপনাকে আক্রমণ করল না কেন?"

প্রফেসর নৌকো বাইতে বাইতে উত্তর দিলেন, "আমি দীর্ঘদিন ওদের সঙ্গে আছি। আমরা পরস্পরকে চিনি, বুঝি।"

সন্দীপ বলল, "তার মানে?"

তার এই কথার কোনো উত্তর দিলেন না প্রফেসর। বাকি পথটা তিনি চুপচাপই রইলেন। সন্দীপ যখন প্রফেসরের ডেরায় এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার নেমে আসছে জঙ্গলে।

ফিরে এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছিল সন্দীপ। রাত আটটা নাগাদ প্রফেসর এলেন সন্দীপের ঘরে। তাঁর হাতে একটা পাত্র। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, "কচ্ছপের মাংসটা তোমার জন্য আগুনে ঝলসে আনলাম। আমার এখানে তো আর রান্নার ব্যবস্থা নেই। খেয়ে দ্যাখো কেমন লাগে।" এরপর তিনি পাত্রটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সন্দীপকে বললেন, "কাল আর পরশু এই দুটো দিন কিন্তু আমি থাকব না। সেই বাঘের বাচ্চাটার সন্ধানে যাব। এই দুটো দিন কিন্তু একাই কাটাতে হবে তোমাকে।"

BanglaBook.org

প্রফেসরের কথা শুনে ঘাবড়ে গেল সন্দীপ। এরকম পরিবেশে একা সে এই বাড়িতে কাটাবে কী করে? সে প্রফেসরকে কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। প্রফেসর বোধহয় বুঝতে পারলেন তার মনের কথা। তাই তিনি বললেন, "তোমার বিশেষ ভয়ের কিছু নেই, শুধু আমার কথাগুলো মনে রাখবে। একটু সতর্ক থাকবে, তা হলেই হবে। আর এটা তোমার কাছে রাখো, মনে বল আসবে।" এই বলে তিনি তাঁর জামার নিচ থেকে রিভলবারটা বের করে টেবিলের উপর রাখলেন।

সন্দীপ টেবিলের কাছে গিয়ে রিভলবারটা নিয়ে দেখতে লাগল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রফেসর একটা চটের থলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। সেটাকে ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "এর মধ্যে একটা ছোট হাঁড়ি আর কিছু চাল-ডাল আছে। আমি বারান্দায় কাঠ রেখে যাব। ইচ্ছে হলে ফুটিয়ে খেতে পারো।"

সন্দীপ প্রফেসরের কথা শুনে বলল, "এখানে চাল-ডাল আপনি কোথা থেকে জোগাড় করলেন?"

প্রফেসর তার কথা শুনে একটু ইতস্তত করে বললেন, "মাসখানেক আগে হলদির চরে একটা পরিত্যক্ত নৌকোয় আমি বস্তাটা পেয়েছিলাম। নৌকোর মাঝিকে মনে হয় বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই চাল-ডালগুলো বোধহয় তারই।" বস্তার জিনিসগুলো মৃত মানুষের, একথা শুনে সন্দীপের মনের ভেতর একটু অস্বস্তি হল। কিন্তু সে তাঁকে কিছু বলল না।

প্রফেসর এরপর সন্দীপকে বললেন, "আমি এবার আসি, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো। কাল যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।" সন্দীপ বলল, "আচ্ছা।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। তিনি চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে টেবিলে বসে মাংস খেতে শুরু করল সন্দীপ। সারাদিন খাওয়া হয়নি। খুব সুস্বাদু না লাগলেও পুরো মাংসটাই শেষ করল। তারপর জল খেয়ে, বাতি নিভিয়ে, রিভলবারটা মাথার কাছে নিয়ে চৌকিতে শুয়ে পড়ল।

৫

প্রফেসরের ডাকে ঘুম ভাঙার পর সন্দীপ দরজা খুলে বাইরে এসে দেখতে পেল প্রফেসর একদম তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে খাকি রঙের পোশাক। কাঁধে রাইফেল, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রাবার সোলের জুতো। তার এক হাতে ঝুলছে ফুট তিনেক লম্বা শক্ত লোহার জালের একটা খাঁচা। সন্দীপ দরজা খোলার পর প্রফেসর বললেন, "গুডমর্নিং সন্দীপ, ঘুম কেমন হল?"

সন্দীপ তাকে গুডমর্নিং জানিয়ে বলল, "ভালো।"

BanglaBook.org

প্রফেসর এরপর বললেন, "তাহলে এখন আমি আসি সন্দীপ? ভয়ের কোনো কারণ নেই, শুধু একটু সাবধানে থাকতে হবে, এই যা। আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি আগেও ফিরে আসতে পারি।"

সন্দীপ বলল, "আচ্ছা।"

এই বলে প্রফেসর পা বাড়ালেন। সন্দীপও ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। তার ইচ্ছে ছিল নিচ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। কিন্তু প্রফেসর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "তোমাকে আর আমার সঙ্গে নীচে আসতে হবে না।"

সন্দীপ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রফেসর নিজের জমিটা পার হয়ে জালে ঘেরা জায়গাটার বাইরে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রফেসর চলে যাওয়ার পর পরে ফিরে এল সন্দীপ। তারপর জানলাটা খুলে সেখানে দাঁড়াল। ভোরের আলোয় খাঁড়ির জল চিকচিক করছে। বাতাসে দুলছে ওপারের জঙ্গল। দুটো বন মুরগি পোকা খুঁটে খাচ্ছে খাঁড়ির পারে। চারপাশে বেশ একটা শান্ত সুন্দর পরিবেশ। কিছুক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে থাকার পর সন্দীপ মুখ-হাত ধুয়ে কয়েকটা ফল খেল। তারপর ভাবতে লাগল, একা সে দু-দিন সময় কাটাবে কী করে? হঠাৎ নিজেকে তার গল্পে পড়া রবীনসন ক্রুসোর মতো মনে হল। অচেনা নির্জন দ্বীপে তারই মতো একাকী সে। তারপর সন্দীপ ভাবল পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখবে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? চৌকিতে প্রফেসরের রিভলবারটা রাখা ছিল। সেটা হাতে নিতেই মনের মধ্যে যেন একটা বাড়তি বল পেল সন্দীপ। রিভলবারটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে খাঁড়ির দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এদিকে আসতে গেলে সন্দীপকে তার ঘরটাকে পেছন দিয়ে আসতে হয়। তার ঘরের দরজা বাদ দিয়ে অন্য তিনটি ঘরের জরজায়ই খাঁড়ির দিকে মুখ করা। প্রফেসর বারান্দার অন্য প্রান্ত দিয়ে এই পাশে আসা-যাওয়া করেন। বারান্দার কাঠের মেঝে কেমন যেন ভেজা ভেজা আর কাদামাখা। সন্দীপের ঘরের জানলা থেকে একটু দূরে এদিকেও একটা ঢালু পাটাতন আছে বারান্দা থেকে নীচে নামার জন্য। তার ঘরের পাশেই ভাঁড়ার ঘরের দরজা বাইরে থেকে দুটো আড়াআড়ি কাঠের পাটাতনে পেরেক ঠুকে বন্ধ করা আছে। সন্দীপ হাঁটতে শুরু করল বারান্দার অন্য প্রান্ত দিয়ে। ভাঁড়ার ঘরের পরেরটাই প্রফেসরের ল্যাবরেটরি। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সন্দীপ। দরজাটা শুধু ভেজানো আছে। তালা দেওয়া নেই। হয়তো এখানে চুরি যাওয়ার কোনো ভয় নেই বলেই। সন্দীপের হঠাৎ ইচ্ছে হল ল্যাবরেটরির ভেতরটা ঘুরে দেখার। কিন্তু সে ভাবতে লাগল প্রফেসরের অনুপস্থিতিতে তার ল্যাবরেটরিতে ঢোকা উচিত হবে কিনা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছেটাকে দমন করতে পারল না। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। একটা আঁশটে আর কোনো এক রাসায়নিকের বিচ্ছিরি গন্ধ মিলেমিশে ছড়িয়ে আছে ল্যাবরেটরিতে। লম্বা ঘরটার মধ্যে লম্বা লম্বা বেশ কয়েকটা কাঠের

BanglaBook.org

টেবিল, র‍্যাক রাখা আছে। সেগুলো নানা ধরনের শিশি-বোতল, টেস্টটিউব ইত্যাদিতে ভর্তি। ঘরের দু-প্রান্তে আরও দুটো দরজা আছে। সন্দীপ বুঝতে পারল, তার একটা প্রফেসরের শোয়ার ঘর, আর অন্যটা তার ভাঁড়ার ঘরে যাওয়ার জন্য। শোওয়ার ঘরের দরজাটা সন্দীপ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার খুব কাছেই। তার পাল্লা দুটো খোলা। ঘরে ঢোকার পর পায়ে পায়ে সন্দীপ এগিয়ে গেল সেই দরজার কাছে। তারপর উঁকি মারল ঘরে। ঘরের অন্য দরজা-জানলা বন্ধ, শুধু দেওয়ালের মাথায় যে ঘুলঘুলির মতো ছিদ্র আছে, তা দিয়ে কিছু আলো ঢুকছে ঘরের ভেতর। আধো অন্ধকার খেলা করছে ঘরে। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে কাদামাখা ঘর। কোনো আসবাব নেই। ঘরের এক কোনায় একটা কাঠের বেদিমতো জায়গার ওপর ডাঁই করে রাখা আছে পচা পাতার রাশি। অবাক হয়ে গেল সন্দীপ। ওটাই তাহলে প্রফেসরের বিছানা! সত্যিই ওঁকে কী কৃচ্ছ্রসাধন করতে হচ্ছে সাধনার জন্য, মনে মনে ভাবল সন্দীপ। এছাড়া ঘরের এক কোনায় দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে কিছু পোশাক। আর কিছুই নেই সেই ঘরে। দরজা থেকে সরে গিয়ে এবার সে মুখ ফিরিয়ে ভালো করে তাকাল ল্যাবরেটরির চারদিকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল ঘরের কোনায় টেবিলের ওপর রাখা অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে কী যেন একটা নড়ছে। কী রয়েছে ওর ভেতর আধো অন্ধকার জায়গাটায়? কৌতূহল নিয়ে সন্দীপ এগিয়ে গেল সেদিকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকোয়ারিয়ামের জলের মধ্যে শুরু হল একটা আলোড়ন। সন্দীপ কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কয়েক মুহূর্ত পর থামল ভেতরের প্রাণীটার দাপাদাপি। সন্দীপ দেখল অ্যাকোরিয়ামের ভেতর থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে একটা কুমিরের বাচ্চা। কিছুক্ষণ তাকে দেখার পর সন্দীপ পা বাড়াল ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য। ঠিক সেই সময় তার চোখে পড়ল, পাশে টেবিলের উপরে রাখা আছে চামড়ায় বাঁধানো একটা বড় খাতা, সঙ্গে একটা কলমও। সন্দীপ খুলে দেখল খুদে খুদে অক্ষরে লেখা আধো অন্ধকার ঘরে ঠিক পড়া যাচ্ছে না। কী লেখা আছে খাতায়? প্রফেসরের অজ্ঞাতবাসের দিনলিপি? খাতাটা নিয়ে সন্দীপ ল্যাবরেটরির দরজার সামনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তারপর পাতা ওলটাতে শুরু করল। সন্দীপ বুঝতে পারল, আসলে খাতাটা প্রফেসরের ল্যাবরেটরি নোটবুক। নানা ধরনের জটিল হিসেব, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি লেখা আঁকা আছে খাতার পাতায়। ইংরাজিতে কিছু লেখাও আছে খাতায়। সবই বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগত বিষয়। সন্দীপ পড়েও তার মানে উদ্ধার করতে পারল না। খাতাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা পাতায় হঠাৎ চোখ আটকে গেল। পাতার নীচের দিকে কী যেন লেখা আছে। সে দেখল, সেখানে লেখা, 'ছেলেবেলায় 'কথামালা' বইয়ে পড়া সেই 'মুনি আর ইঁদুরের গল্প'র তাৎপর্য বুঝতে পারছি এতদিনে। গল্পের সেই মুনি আসলে বিজ্ঞানী ছিলেন।'

লেখাটা দেখে অবাক হয়ে গেল সন্দীপ। এই লেখার মানে কী! এরকম আরও কিছু লেখা আছে কিনা তা দেখার জন্য পরের পাতাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

BanglaBook.org

গোটা দশেক পাতা ওলটানোর পর সে একই ধরনের লেখা দেখল। প্রফেসর সেখানে লিখেছেন,' এবার পরীক্ষা নিজের উপর। একটাই শুধু ভয়, যদি ফিরতে না পারি! বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার কথা কে জানাবে বিশ্বকে?' খাতাটার কোনো পাতাতেই কোনো সাল তারিখের উল্লেখ নেই, ফলে এই লেখাগুলো যে প্রফেসর কবে লিখেছেন তা বোঝার কোনো উপায় রইল না। এ ধরনের শেষ লেখা সন্দীপ যেটা দেখল, সেটা একদম মোটা খাতাটার শেষের দিকে। দ্বিতীয় লেখার সঙ্গে দূরত্ব প্রায় একশো পাতা। তবে এই লেখাটা যে সন্দীপ এখানে আসার পর প্রফেসর লিখেছেন, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না, কারণ তিনি লিখেছেন, 'সন্দীপ যে এখানে আসবে আমি জানতাম, কিন্তু আমি ওকে কীভাবে বলব আমার কথা? ও বিজ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে রাজি হবে তো? তারপর আর কোনো লেখা নেই। পাতাগুলো একদম সাদা। খাতাটা বন্ধ করে দিল সন্দীপ। খাঁড়ির দিকে তাকাল সে। কখন যেন একপাল বুনো শূকর এসে হাজির হয়েছে খাঁড়ির পারে। মাটি খুঁড়ছে তারা। মনে হয় কন্দমূলের লোভে। সেদিকে তাকিয়ে সন্দীপ ভাবতে লাগল এই লেখাগুলোর মানে কী? একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে, প্রফেসরের লেখাগুলোর মধ্যে কোনো কিছুর যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার পর সে আবার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে খাতাটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে ল্যাবরেটরির দরজাটা আগের মতো বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল।

বিকেল পর্যন্ত ঘরেই কাটিয়ে দিল সন্দীপ। কিছুটা ঘুমিয়ে, কিছুটা সময় কাটাল বই পড়ে। সন্দীপের চোখে পড়েছে প্রফেসর তার ঘরের দরজার কাছে বারান্দার এক কোণে শুকনো কাঠ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু দুপুরের রান্না না করে সে ফল খেয়েই কাটাল। বিকেলবেলা হাঁটবার জন্য বাইরে বেরিয়ে একটু নীচে নেমেছিল সে। তারপর আবার ঘরে ফিরে দরজা-জানলা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে সঙ্গে আনা বইটা পড়তে বসে গেল। রাত আটটা নাগাদ বইটা বন্ধ করল সন্দীপ। কিছু খেতে তার ইচ্ছা করছে না। শুধু জল খেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। অন্ধকার ঘর, কোথাও যেন শব্দ হচ্ছে। একটা মৃদু খসখস শব্দ। ঘরের মধ্যে কোনো প্রাণী ঢোকেনি তো! সন্দীপ মাথার কাছ থেকে রিভলবারটা হাতে নিল। তারপর বিছানায় শুয়ে শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করতে লাগল, মাঝে মাঝে শব্দটা শোনা যাচ্ছে, একটানা নয়। সন্দীপ বুঝতে পারল, শব্দটা আসলে খাঁড়ির দিকের বারান্দা থেকে আসছে। কীসের শব্দ ওটা? রিভলবারটা হাতে নিয়ে চৌকি থেকে নীচে নেমে অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে। শব্দটা এবার স্পষ্ট কানে আসতে লাগল। যেন কোনো প্রাণী ঘষটে ঘষটে বারান্দায় চলেফিরে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

তবে সম্ভবত সে বেশ ভারী। তার দেহের ভারে পুরোনো কাঠের মেঝে থেকে মচমচ শব্দ হচ্ছে। কিন্তু কী প্রাণী ওটা? প্রফেসর রাতে জানলা খুলতে বারণ করেছে। একটা কৌতূহল পেয়ে বসল তাকে। সাবধানে জানলার পাল্লাটা ধীরে ধীরে ফাঁক করল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই আলোয় সন্দীপ স্পষ্ট দেখতে পেল বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এক অতিকায় কুমির! লেজটা মাঝে মাঝে সে এপাশে ওপাশে নাড়াচ্ছে। কাঠের মেঝেয় লেজের ঘষটানিতে খসখস শব্দ হচ্ছে। সন্দীপ দেখতে লাগল। কুমিরটা একবার বারান্দার দিয়ে সন্দীপের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের ঘরের দিকে, পরক্ষণেই আবার ফিরে আসছে। ঠিক যেন বারান্দায় পায়চারি করছে কুমিরটা।

একসময় কুমিরটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সন্দীপের জানলার একটু দূরে। তারপর সে একটা বিরাট বড় হাঁ করল। সন্দীপ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল, তার ভয়ংকর মুখগহ্বর। চোয়ালে সাজানো সারি সারি দাঁত! সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও পেয়ে বসল সন্দীপকে। তার মনে হল, কয়েক হাত দূরে ওই ভয়ংকর চোয়াল যেন তারই অপেক্ষায় রয়েছে। কুমিরটা যদি এখন ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে কী হবে? এই ঘুণ ধরা কাঠের পাটাতনের দেওয়াল কি আটকাতে পারবে তাকে! রিভলবারটা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সন্দীপ। কুমিরটা বাইরে একইভাবে হাঁ করে আছে। ওকে আটকাতে হবে। নিশ্চয়ই ও সন্দীপের জন্যই খাঁড়ি থেকে ওপরে উঠে এসেছে। নইলে বারান্দায় কীসের প্রতীক্ষায় রয়েছে প্রাণীটা? সন্দীপ আস্তে আস্তে রিভলবার ধরা হাতটা উঠিয়ে আনল জানলার পাল্লার ফাঁকে। ঠিক সেই সময় খাঁড়ির পার থেকে একটা চিতল হরিণের ডাক শোনা গেল, 'কাঁআক, কাঁক।'

ডাকটা শোনামাত্র কুমিরটা জানলার দিক থেকে ঘাড় তুলে খাঁড়ির দিকে তাকাল। যেন এই সময়ের অপেক্ষায় ছিল সন্দীপ। অপটু কাঁপা কাঁপা হাতে কুমিরটাকে লক্ষ্য করে সে চালিয়ে দিল গুলি। প্রচণ্ড শব্দ আর ধোঁয়ায় ভরে গেল জানলার চারপাশ। গুলিটা প্রাণীটার গায়ে লাগল কিনা বুঝতে পারল না। গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ল নীচের জমিতে। তারপর বিদ্যুৎগতিতে জমিটা পার হয়ে ঝাঁপ দিল খাঁড়ির জলে। চাঁদের আলোয় বেশ খানিকটা জল লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে।

জানলার পাল্লাটা তারপর জোরে বন্ধ করে দিল সন্দীপ। এবার বুকের ধুকপুকুনি একটু কমলে একটা মোম জ্বালিয়ে চৌকিতে বসল সে। বসে বসে ভাবতে লাগল প্রাণীটা যদি আবার ফিরে আসে তাহলে কী হবে? তার লেজের এক আঘাতেই তো ভেঙে পড়তে পারে পুরোনো দরজা-জানলা, কাঠের দেওয়াল। কালকের রাতটাও তো একাই কাটাতে হবে। হঠাৎ মনে মনে প্রফেসরের ওপর রাগ হল সন্দীপের। কেন তিনি এরকম ভয়ংকর জায়গায় তাকে একলা রেখে গেলেন? একটা রিভলবার দিয়ে সন্দীপ কি ঠেকাতে পারবে

BanglaBook.org

বাঘ বা কুমিরকে? কালকের দিন-রাত যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায়, তাহলে প্রফেসর ফিরে আসার পর সে তাকে লোকালয়ে পৌঁছে দিতে বলবে। কিন্তু কথাটা ভাববার পরই সন্দীপ আবার ভাবল প্রফেসর কত কিছু করেছেন তার জন্য। তার তুচ্ছ জীবনের অনেকটাই তো প্রফেসরের দান। এ কী ভাবছে সে! তার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না সন্দীপ! এ তো তার কর্তব্য। তার যত কষ্টই হোক, প্রফেসরের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার কথা মুখে আনবে না সে। বাকি রাতটা চৌকিতে বসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিল সন্দীপ। এক সময় খাঁড়ির পার থেকে বুনো মোরগের ডাক ভেসে এল। তারপর ধীরে ধীরে দেওয়ালের মাথার ওপরে ফোকর গলে আলো আসতে শুরু করল। আবার জেগে উঠতে শুরু করেছে বাইরের পৃথিবী। তা দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে রিভলবারটা নিয়ে শুয়ে পড়ল সন্দীপ।

৬

সন্দীপের যখন ঘুম ভাঙল সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপর উঠে গিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রাতের ঘটনার কথা চিন্তা করল সে। ঘটনাটা সত্যি না দুঃস্বপ্ন! ছ-ঘরা রিভলবারটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে সেটা খুলে ফেলল। তার একটা ঘর শূন্য। এরপরেই জানলার ঠিক নীচে গুলি চালাবার পর ছিটকে পড়া ফাঁকা কার্তুজের খোলটা চোখে পড়ল। ঘটনাটা স্বপ্ন নয় তা হলে! রিভলবারটা ঠিক করে নিয়ে সন্দীপ এর পর উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলার ধারে। তারপর জানলাটা খুলল সে। ফাঁকা বারান্দা, সেই শূকরের দলটা আবার খাঁড়ির পারে এসেছে মাটি খুঁড়তে। কালকের সেই প্রাণীটা তা হলে কাছাকাছি কোথাও নেই! রিভলবারটা কোমরে গুঁজে নিল সে। জিনিসটাকে সবসময় কাছেই রাখতে হবে। ঘরের দরজাটা খুলল সন্দীপ। তারপর বারান্দায় জল নিয়ে বেরিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর সে খাঁড়ির দিকের বারান্দায় দাঁড়াবার পর শূকরের পালের দাঁতাল দলপতি বাতাসে সন্দীপের বিজাতীয় গন্ধ টের পেল। সে ঘাড় উঠিয়ে একবার বারান্দার দিকে তাকাল। তারপর হয়তো ভয়ের কিছু নেই বুঝতে পেরে আবার মাটি খুঁড়তে লাগল। সন্দীপ তাকাল বারান্দার কাঠের মেঝের দিকে। মেঝেয় লম্বা লম্বা দাগ। কাল রাতে কুমিরটার চলেফিরে বেড়ানোর স্পষ্ট চিহ্ন আঁকা হয়ে রয়েছে। হঠাৎ এক জায়গায় মেঝের ওপর কালচে রঙের কয়েক ফোঁটা কী যেন পড়ে রয়েছে দেখতে পেল সন্দীপ। জায়গাটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকা ফোঁটাগুলোকে দেখল সে। তার মনে হল, ওগুলো যেন জমাট বাঁধা রক্তের ফোঁটা। তবে একেবারে নিশ্চিত হতে পারল না এ ব্যাপারে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, এটা কি কুমিরের রক্ত? এখান দিয়েই তো লাফ দিয়ে নীচে নেমে পালিয়েছিল প্রাণীটা। তবে কি গুলিটা লেগেছিল কুমিরটার গায়ে? একবার ভাবল, নীচে নেমে দেখে আসবে জমিতে এরকম কোনো ফোঁটা

BanglaBook.org

পড়ে আছে কি না! কিন্তু সাহসে কুলোল না তার। সে হাঁটতে শুরু করল প্রফেসরের ল্যাবরেটরির দিকে। ল্যাবরেটরির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রফেসরের দরজার সামনের মেঝেতেও লম্বা লম্বা স্পষ্ট দাগ। তার আরও একবার ল্যাবরেটরির ভিতরটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হল। দরজার পাল্লা দুটো ভালো করে খুলল সে। আলো ঢুকল ঘরের ভেতর। কিন্তু এ কী! ঘরের মেঝেতেও তো আঁকা রয়েছে সেই দাগগুলো! তা হলে কুমিরটা ঘরে ঢুকেছিল নাকি! রিভলবারটা কোমর থেকে বের করে হাতে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল সন্দীপ। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ঘরের ভিতর। হাঁটতে হাঁটতে একসময় সেই অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে হাজির হল সে। অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সন্দীপ। আরে, কালকের সেই কুমিরের বাচ্চাটা গেল কোথায়? বদলে তার মধ্যে রাখা আছে একটা একই মাপের নিরীহ তারখেল। সে চোখ পিটপিট করছে তাকে দেখে। তা হলে কি গতকাল ভুল দেখেছিল সে? হতে পারে। হয়তো এখানে এসে বেশ কয়েকবার কুমির দেখার জন্যে তার হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে। নইলে কুমিরের বাচ্চা তো আর তারখেল হয়ে যেতে পারে না! কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াবার পর সন্দীপ আবার ফিরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ল সেই খাতাটার ওপর। একই জায়গায় রাখা আছে খাতাটা। তার মনে পড়ে গেল প্রফেসরের লেখাগুলোর কথা। প্রফেসর কী বলতে চেয়েছেন ওই লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে? ভাবতে ভাবতে সন্দীপ গিয়ে দাঁড়াল ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে। এই ঘরটা কাল তার দেখা হয়নি। ঘরের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করা আছে। সন্দীপ টেনে খুলে ফেলল পাল্লাটা। ঘরটা খুব বড় নয়, মাঝারি ধরনের। এর ওপাশের ঘরটাই সন্দীপের। ঘরের এক পাশে দেওয়ালের কাছে মুখ বাঁধা কিছু বস্তা রাখা আছে। আর-এক পাশে মেঝের উপর রাখা আছে কিছু শিশি-বোতল। আর রয়েছে একটা লম্বা টেবিল। তার উপর কিছু নেই। ঘরটা একবার ভালো করে দেখার পর সে ঘরের দরজাটা আগের মতো বন্ধ করে দিয়ে পা বাড়াল ল্যাবরেটরির বাইরে যাওয়ার জন্য। দু-পাশে টেবিলের সারি, কয়েক পা হাঁটার পরই হঠাৎ যেন সন্দীপের একটা পা মেঝের মধ্যে ঢুকে গেল। পড়েই যাচ্ছিল সে, কিন্তু একটা টেবিলের পায়া ধরে কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। পা-টা টেনে মেঝে থেকে বের করে আনল। প্রথম সে ভাবল, কাঠের পচা পাটাতন ভেঙে বোধহয় পা ঢুকে গিয়েছে তার। ভালো করে তাকাল জায়গাটার দিকে। আর তারপরেই মনে হল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। মেঝেতে যেন একটা ছিদ্র আছে, আর কয়েকটি আলগা কাঠের পাটাতন দিয়ে সেটা ঢাকা দেওয়া। কোনোভাবে তারই একটা পাটাতন সরে যাওয়ার ফলে পা ঢুকে গিয়েছিল সন্দীপের। জায়গাটায় বসে পড়ল। তারপর আলগা কাঠগুলো সরিয়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা গোল ফোকর। অনায়াসে একটা মানুষ গলে যেতে পারে। সন্দীপ সেই ফোকর দিয়ে নীচে তাকাতেই আরও একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। সেখান থেকেও একটা ঢালু পাটাতন নেমে দিয়েছে মাটির

BanglaBook.org

দিকে। অর্থাৎ ল্যাবরেটরি থেকে বাইরে আসা-যাওয়ার এটা একটা রাস্তা! সন্দীপ এরপর কাঠের পাটাতনগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে, ল্যাবরেটরি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। খাঁড়ির দিকে তাকাল সন্দীপ। সেই শূকরের দলটা কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। খাঁড়ির পাড় নিঝুম, কোনো জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন নেই সেখানে। কেমন যেন একটা থমথমে পরিবেশ চারপাশে। সন্দীপ অনেকক্ষণ ঘরের বাইরে রয়েছে। সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত বলে মনে করল না। পা বাড়াল নিজের ঘরে ফেরার জন্য।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চৌকিতে শুয়ে পড়ল সন্দীপ। শোওয়ার পর কয়েকটা প্রশ্ন ঘিরে ধরল তাকে। নিচ থেকে বাড়ির ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়ির বদলে ঢালু পাটাতনের ব্যবহার কেন? প্রফেসরের নোটবুকে লেখা কথাগুলোর কী অর্থ? প্রফেসর হঠাৎ কথামালার গল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন কেন? বিজ্ঞানের স্বার্থে সন্দীপের নিজেকে কতখানি উৎসর্গ করতে হবে? প্রফেসরের লেখাগুলোর মধ্যে কীসের যেন একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, যেটা ধরেও ধরতে পারছে না সে! প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল শেষ বিকেলে। শুয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, বাইরে সন্ধে নামতে চলেছে। জানলাটা বন্ধ করে দিতে হবে এবার। আরও একটা রাত আসছে। কুমিরটা যদি আজ রাতেও আবার ফিরে আসে? উঠে বসল সন্দীপ। মনে সাহস রাখতে হবে। জানলাটা বন্ধ করার জন্য চৌকি ছেড়ে নীচে নামতে গেল। ঠিক সেই সময় শুনতে পেল, তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে! কান খাড়া করল সন্দীপ। হ্যাঁ, এ তো প্রফেসরের গলা। তিনি আজই ফিরে এসেছেন তা হলে! চৌকি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখতে পেল, প্রফেসর নীচের জমিটায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই মুহূর্তের মধ্যে সব আতঙ্ক মুছে গেল সন্দীপের মন থেকে। সে ছুটে নীচে নেমে গিয়ে দাঁড়াল প্রফেসরের সামনে। প্রফেসরের পোশাক ধুলো-কাদা মাখা, মাথার চুল উশকোখুশকো, চোখে-মুখে পরিশ্রম আর ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সন্দীপ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, " আপনার কাজ হয়েছে প্রফেসর?"

প্রফেসর মুখে কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু আঙুল তুলে দেখালেন পাশে নামিয়ে রাখা খাঁচাটার দিকে। খাঁচাটার ওপর একটা চটের কাপড় জড়ানো আছে। প্রফেসরের কথা শুনে সন্দীপ খাঁচাটার উপর ঝুঁকে পড়ে চটের কাপড়টা একটু সরাল। দেখতে পেল তার ভিতর গুটিসুটি মেরে বসে আছে বিড়ালের চেয়ে একটু বড় একটা প্রাণী, বাঘের বাচ্চা! সন্দীপ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "বাঘিনীটাকে কী সত্যিই মেরে ফেললেন আপনি?"

প্রফেসর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিলেন, "না, মারতে পারিনি, গুলি খেয়ে পালিয়ে গিয়েছে আহত প্রাণীটা।"

BanglaBook.org

সন্দীপ প্রফেসরকে বলল, "জানেন, কাল রাতে একটা কুমির খাঁড়ি থেকে বারান্দায় উঠে এসেছিল। আমি গুলি করে তাড়িয়েছি প্রাণীটাকে।"

সন্দীপের মনে হল, তার কথা শুনে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল প্রফেসরের চোখ। তিনি সন্দীপকে কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন নিজেকে নিমেষে সংযত করে নিলেন। এরপর তিনি একটু রুক্ষ স্বরে বললেন, "আমার উপর দিয়ে ধকল গিয়েছে। খাঁচাটা নিয়ে ওপরে চলো।" সন্দীপ খাঁচাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওপরে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করল, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসরও। সন্দীপের মনে হল, প্রফেসর যেন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। কাঠের পাটাতন বেয়ে উপরে ওঠার সময় 'উঃ' করে একটা যন্ত্রাণাসূচক শব্দ যেন বের হল তাঁর মুখ থেকে। ওপরে ওঠার পর প্রফেসর সন্দীপকে বললেন, "খাঁচাটা তোমার ঘরেই থাকবে। একে অন্য ঘরে রাখার মতো পরিবেশ নেই।" তারপর তিনি বললেন, "রিভলবারটা এবার আমায় দাও। আমি এসে গিয়েছি, ওটা আর এখন তোমার দরকার হবে না।"

রিভলভারটা চৌকির উপর রেখেই ঘর থেকে প্রফেসরের ডাক শুনে বাইরে বেরিয়েছিল সে। প্রফেসরের কথা শুনে সন্দীপ ঘরে ঢুকে খাঁচাটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল। তারপর রিভালবারটা চৌকি থেকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে প্রফেসরের হাতে দিল। জিনিসটা তিনি হাতে নেওয়ার পর সন্দীপকে বললেন, "ভালো করে দরজা-জানলা বন্ধ করে দাও, আর খাঁচার ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়ো। অনেকক্ষণ ঢাকা আছে প্রাণীটা।" এই বলে প্রফেসর সন্দীপের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য। ঠিক তখনই সন্দীপের চোখে পড়ল প্রফেসরের শরীরের পিছনের অংশে পায়ের ওপরের কিছুটা রক্তে ভিজে আছে। তা হলে কী কোনোভাবে আহত হয়েছেন প্রফেসর? কিন্তু কী ভাবে? প্রফেসর এগিয়ে গেলেন বারান্দা ধরে আর সন্দীপ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজা বন্ধ করার পর সে প্রথমে টেবিলের কাছে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালাল, তারপর জানলাটা বন্ধ করে খাঁচাটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোনায় রাখল। চটের আবরণটা খাঁচার ওপর থেকে সরিয়ে নিল সন্দীপ। প্রাণীটা তাকাল তার দিকে। তার চোখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। কী সুন্দর দেখতে বাচ্চাটাকে। সন্দীপের একবার ইচ্ছে হল, খাঁচার ফাঁকে হাত দিয়ে প্রাণীটাকে ছোঁয়। কিন্তু তার সাহসে কুলোল না। বাচ্চা হলেও সে বাঘের বাচ্চা তো! এই প্রাণীটাই বড় হলে শাসন করবে সারা জঙ্গল। সন্দীপ খাঁচাটার কাছ থেকে সরে এসে চৌকির ওপর বসল, তারপর তাকিয়ে রইল বাচ্চাটার দিকে।

রাত আটটা নাগাদ প্রফেসরের ডাক শুনে দরজা খুলল সন্দীপ। ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। পোশাক পালটে এসেছেন তিনি। সন্দীপ দেখল প্রফেসরের ডান হাতে ধরা আছে অদ্ভুত দেখতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। সন্দীপের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কী, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?"

BanglaBook.org

সন্দীপ উত্তর দিল, "না ঘুমোইনি।"

প্রফেসর তাকালেন খাঁচাটার দিকে। সন্দীপ দেখল, বাচ্চাটা থরথর করে কাঁপছে। সে একটু ইতস্তত করে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বাচ্চাটাকে ইঞ্জেকশন দেবেন?"

প্রফেসর বাচ্চাটাকে দেখতে দেখতে উত্তর দিলেন, "না, ওর শরীর থেকে একটু রক্ত নেব।"

সন্দীপ অবাক হয়ে বলল, "ওইটুকু প্রাণীর শরীর থেকে রক্ত নেবেন!"

প্রফেসর শীন্ত গলায় উত্তর দিলন, "ওতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না।"

কথাগুলো বলার পর প্রফেসর তাঁর হাতের সিরিঞ্জটা আলোর দিকে ধরে কী যেন দেখলেন। সিরিঞ্জের পেটটা গোল বাটির মতো। তার অর্ধেক কী একটা হলুদ রঙের তরলে ভর্তি। প্রফেসর খাঁচার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে বসলেন। বাচ্চাটার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। প্রফেসর বাঁ হাতে খাঁচার দরজাটা খুলে বাচ্চাটার ঘাড় ধরে বের করে আনলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে তার পিঠের কাছে সুচটা বিঁধিয়ে রক্ত টেনে নিলেন। বাচ্চাটাকে এরপর আবার খাঁচার ভিতরে পুরে তার দরজা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রফেসর কাজটা করলেন, তাতে তার এক মিনিটের বেশি সময় লাগল না। রক্তটা সিরিঞ্জের তরলের সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত নীল রং হয়ে গেল। প্রফেসর এবার সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার আমি যাই। সারারাত ল্যাবরেটরিতে জেগে আমাকে কাজ করতে হবে।" প্রফেসর পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

সন্দীপের আবার চোখ পড়ল প্রফেসরের শরীরের পিছনের সেই জায়গায়। সে দেখতে পেল, প্রফেসরের নতুন পোশাকও রক্তে ভিজে উঠতে শুরু করেছে। তা দেখে সন্দীপ বলল, "আপনি কি আহত স্যার? আপনার পোশাকে রক্ত কেন?"

তার কথা শুনে প্রফেসর যেন একটু চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। তারপর বললেন, "ও কিছু না, জঙ্গলে পড়ে গিয়ে সামান্য একটু আহত হয়েছি আমি। ও ঠিক হয়ে যাবে।" এই বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রফেসর চলে যাওয়ার পর সামান্য কিছু খাবার আর জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সন্দীপ। মাঝরাতে সেদিনও কীসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার। কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শুনেই বিছানার ওপর উঠে বসল সন্দীপ। সেই কুমিরটা আবার ফিরে আসেনি তো! কান খাড়া করে সন্দীপ বোঝার চেষ্টা করল শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে। হঠাৎ সে লক্ষ করল অন্ধকার ঘরের কাঠের মেঝের ওপর কোথা থেকে যেন হালকা আলো এসে পড়ে একটা বৃত্ত রচনা করেছে। কোথা থেকে আসছে আলোটা? কয়েক মুহূর্ত পর সে বুঝতে পারল, আলোর রেখাটা আসছে তার ঘর আর ভাঁড়ার ঘরের মাঝে যে কাঠের দেওয়াল আছে, তার একটা ছিদ্র দিয়ে। তার মানে ওপাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এরপর সে বুঝতে পারল,

BanglaBook.org

শব্দটাও আসছে ও ঘর থেকেই। এত রাতে ও ঘরে কী করছেন প্রফেসর! কৌতূহল নিয়ে সন্দীপ চৌকি ছেড়ে নেমে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের কাছে, তারপর সন্তর্পণে চোখ রাখল সেই ছিদ্রে। সন্দীপের চোখের সামনে ফুটে উঠল পাশের ঘরের বৃত্তকার একটা ছবি। সে দেখতে পেল, ও ঘরের সেই টেবিলের উপর একটা মোম জ্বলছে। তিনি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা খুব সরু, লম্বা ছুরি মোমের শিখায় গরম করছেন। ওই ছুরি দিয়ে তিনি কী করবেন? সন্দীপ দেখতে লাগল দৃশ্যটা। কিছুক্ষণ পর ছুরিটা গরম হয়ে গেলে প্রফেসর পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। সন্দীপের স্পষ্ট চোখ পড়ল, প্রফেসরের থাইয়ের পিছনের অংশে একটা গোল ক্ষতচিহ্ন। এরপর প্রফেসর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, যা দেখে দেওয়ালের এপাশে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠল সন্দীপ। প্রফেসর ছুরির গরম ফলাটা বিঁধিয়ে দিলেন তাঁর ক্ষতস্থানের মধ্যে। তারপর চাড় দিয়ে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে পা বেয়ে বইতে শুরু করল রক্তের স্রোত। যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে লাগল প্রফেসরের মুখ। সন্দীপ আর দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিল না। সে ভাবল চোখটা সরিয়ে নেবে। ঠিক সেই সময় ক্ষতস্থান থেকে কী একটা ছোট্ট জিনিস যেন ছিটকে বেরিয়ে ঠক করে কাঠের মেঝেয় পড়ল। মেঝেটা সন্দীপ দেখতে পাচ্ছে না, তাই প্রথমে সে বুঝতে পারল না জিনিসটা কী! প্রফেসর ছুরিটা ক্ষতস্থান থেকে বের করে, ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন সেই ছোট্ট জিনিসটা। সেটা ভালো করে দেখার জন্য আলোর কাছে আনলেন। সন্দীপ স্পষ্ট দেখতে পেল, প্রফেসর দু-আঙুলের মধ্যে ধরা আছে রিভলবারের ছোট্ট একটা বুলেট! সেটা নেড়েচেড়ে দেখার পর প্রফেসর ফুঁ দিয়ে মোমটা নিভিয়ে দিলেন। সন্দীপের চোখের সামনে মুছে গেল সব কিছু। তা হলে তিনি পড়ে গিয়ে আহত হননি, গুলিতে আহত হয়েছেন! সন্দীপকে মিথ্যে বলেছেন তিনি। কিন্তু কে গুলি করল তাঁকে? বনরক্ষীরা, না তাঁর কোনো শত্রু? এসব ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে পড়ল সন্দীপ।

BanglaBook.org

৭

শেষরাতের দিকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সন্দীপ। এক গহিন খাঁড়ি দিয়ে সে একলা নৌকো বেয়ে চলেছে। অন্ধকার নেমে আসছে চারপাশে। একসময় সে হাজির হল সেই জায়গায়। সে দেখতে পেল বাজপড়া সেই শিমুল গাছের নীচে প্রফেসর দাঁড়িয়ে আছেন। প্রফেসর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি একা কোথায় যাচ্ছ সন্দীপ?"

সে উত্তর দিল, "ফিরে যাচ্ছি।"

প্রফেসর হেঁকে বললেন, "আমার কাজ শেষ না হতেই চলে যাচ্ছ তুমি! কিন্তু তোমার নৌকো তো ফুটো হয়ে গিয়েছে। তুমি যাবে করে কী করে? এখানে আমার নৌকো রাখা আছে, তুমি নিয়ে যাও।"

তার কথা শুনে সন্দীপ দেখতে পেল সত্যিই তার নৌকো ফুটো হয়ে গিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি নদীর চরে নৌকো ভিড়িয়ে দিল। ঠিক সেই সময় ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত চারপাশে কিছু দেখতে পেল না। তারপর আকাশে চাঁদ উঠল, সন্দীপ দেখল, খাঁড়ির চরে প্রফেসরের নৌকাটা রাখা আছে। কিন্তু প্রফেসর কোথাও নেই। সে চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল তাকে। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে এল বাঘের ডাক। আর অপেক্ষা না করে সে চেপে বসল প্রফেসরের নৌকোয়। চলতে শুরু করল নৌকো। খাঁড়ি বেয়ে বড় গাঙে গিয়ে পড়ল। তারপর চাঁদের আলোয় উল্কার গতিতে ছুটতে শুরু করল নৌকোটার। সে কিছুতেই আর গতি কমাতে পারছে না নৌকোটার। কোথায় চলেছে সে? ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ সে আবার দেখতে পেল প্রফেসরকে। নদীর চরে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন। সন্দীপ তাকে নৌকো থেকে চেঁচিয়ে বলল, "প্রফেসর, আপনার নৌকো আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

প্রফেসরও চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, "ও তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে মোহনার দিকে। ওখানেই ওর বাসা।"

তার কথা শুনে সন্দীপ চমকে উঠে তাকাল নৌকোটার দিকে। আরে নৌকো কোথায়! সন্দীপ চেপে বসে আছে বিরাট বড় এক কুমিরের পিঠে! আতঙ্কে সে চিৎকার করে বলে উঠল, "প্রফেসর, আমাকে বাঁচান! এ যে একটা কুমির!"

তার কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠলেন প্রফেসর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কুমিরটা সন্দীপকে পিঠে নিয়ে ডুব দিল জলে। স্বপ্নে এই পর্যন্ত দেখে আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল সন্দীপের। বিছানায় উঠে বসল। একেবারে ঘেমে গিয়েছে। সে বুঝতে পারল সকাল হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বাইরে এল সন্দীপ। কিন্তু বাইরে আলো এত কম কেন! হাতের ঘড়িতে দেখল, সাড়ে সাতটা বাজে। তাহলে? কয়েক মুহূর্ত পর সন্দীপ বুঝতে পারল আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাসও গায়ে লাগছে। সে কোথাও প্রফেসরকে দেখতে পেল না। তাই ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল খাঁড়ির দিকের বারান্দায়। এবার সে দেখতে পেল প্রফেসরকে। খাঁড়ির কাছে এক জায়গায় মাটির দিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছেন তিনি। তার এক হাতে ঝুলছে ছোট্ট একটা প্রাণী। মনে হয় সেটা মারা গিয়েছে। তার মাথাটা মাটির দিকে ঝুলছে। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি একবার তাকালেন বারান্দার দিকে। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন। তারপর আবার তাকালেন মাটির দিকে। বারান্দা থেকে পাটাতন বেয়ে নীচে নামল সন্দীপ। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল প্রফেসরের কাছে। তার সারা শরীর জলে ভেজা। তার হাতে ঝুলছে সদ্য মৃত ছোট্ট হরিণের বাচ্চা। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুইয়ে পড়ছে তার শরীর থেকে।

BanglaBook.org

সন্দীপ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর প্রফেসর মুখ না তুলে আঙুল দিয়ে সামনের মাটির ওপর দেখালেন। সেদিকে তাকিয়ে সন্দীপ বলল, "এ তো বাঘের পায়ের ছাপ!"

সেদিকেই চোখ রেখে তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, "বাঘ নয়, বাঘিনীর। যার বাচ্চা রয়েছে তোমার ঘরে। কাল আমাকে ও আড়াল থেকে অনুসরণ করে চলে এসেছে এখানে। কাল সারারাত ও ঘুরে বেরিয়েছে বাড়ির চারপাশে। মনে হয় ও বুঝতে পেরেছে বাচ্চাটা এখানেই আছে।" এরপর একটু হেসে তিনি বললেন, "একে আহত বাঘিনী। তার ওপর বাচ্চাকে খুঁজছে। এই মুহূর্তে ওর চেয়ে ভয়ংকর প্রাণী গোটা সুন্দরবনে নেই।"

এই বলে প্রফেসর মুখ তুলে তাকালেন সন্দীপের দিকে। সন্দীপ দেখতে পেল তাঁর মুখ আর চিবুকে কাঁচা রক্ত লেগে রয়েছে। তা দেখে সন্দীপ বলল, "এ কী! আপনার মুখে রক্ত কেন?"

তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর তার জামার হাতা দিয়ে ঘষে রক্তটা মুছে ফেলে বললেন, "ও, এই হরিণের বাচ্চাটার রক্ত কোনোভাবে মুখে লেগে গিয়েছে আর কি! তোমার ঘরে যে বাচ্চাটা আছে সে তো নরম মাংস ছাড়া কিছু খেতে পারবে না, তাই এই বাচ্চাটাকে মারতে হল।" সন্দীপ তার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে বলল, "ও! কীভাবে মারলেন বাচ্চাটাকে?" প্রফেসর তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। আর তখনই বাজের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দুজনেই দৌড়লেন বারান্দায় ওঠার জন্য।

বারান্দায় ওঠার পর সন্দীপ নিজের ঘরে ফিরে এল, আর প্রফেসর চলে গেলেন তার নিজের ঘরের দিকে। আধ ঘণ্টা পরে প্রফেসর এসে ধাক্কা দিলেন সন্দীপের ঘরের দরজায়। দরজা খোলার পর প্রফেসর ঘরে ঢুকলেন। তার এক হাতে পাতায় মোড়া কী একটা জিনিস, আর অন্য হাতে কয়েক টুকরো কাঁচা মাংস। পাতা জড়ানো জিনিসটা তিনি সন্দীপের হাতে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কিছু খেজুর আছে, তোমার জন্য আনলাম।" তারপর তিনি মাংসের টুকরোগুলো নিয়ে এগিয়ে গেলেন খাঁচাটার দিকে। সন্দীপ দেখল প্রফেসরকে দেখেই বাচ্চাটা আবার কাঁপতে শুরু করেছে। খাঁচার সামনে বসতে বসতে প্রফেসর সন্দীপকে বললেন, "তুমি এর বৈজ্ঞানিক নাম জান?"

সন্দীপ বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও এটা সে জানে, বলল, "প্যানথেরা টাইগ্রিস।"

প্রফেসর বললেন, "বাঃ"। খাঁচার দরজা খুলে মাংসের টুকরোগুলো তার ভেতর ঢুকিয়ে দরজা আবার বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সন্দীপের দিকে ফিরে বললেন, "এখন আমি আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকব। রাতে আমি আসব তোমার ঘরে। তোমাকে আমি আমার গবেষণার ব্যাপারে কিছু কথা বলব, যা আমি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি জানে না। তারপর তোমাকে নিয়ে আজ থেকে আমার শেষ কাজ শুরু করব।"

BanglaBook.org

সন্দীপ প্রফেসরের কথা শুনে বলল, "আচ্ছা।"

এরপর প্রফেসর খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ পূর্ণিমার জোয়ার, তারপর যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে জোয়ারের জল শেষে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।" প্রফেসরের কথা শুনে সন্দীপের হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কুমিরটার কথা। কারণ, প্রফেসরের মুখ থেকেই সন্দীপ শুনেছে যে, জোয়ারের জলের সঙ্গে কুমির ভেসে আসে দ্বীপে। আর তখন নাকি তারা বাঘকেও জলে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তাই সে প্রফেসরের কথা শুনে বলল, "জোয়ারের জলের সঙ্গে সেই কুমিরটাও যদি চলে আসে তাহলে কী হবে?'

সন্দীপের প্রশ্ন শুনে তার চোখের দিকে তাকালেন প্রফেসর। তারপর শান্ত গলায় বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই। সে যদি তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত তাহলে অনেক আগেই করতে পারত।"

এই অদ্ভুত কথা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করে জানলা খুলে দাঁড়াল সন্দীপ। খাঁড়িটা বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। প্রচণ্ড বাতাসে জলের ছাট বারান্দা টপকে তার মুখে এসে লাগছে। জানলাটা বন্ধ করে চৌকিতে শুয়ে পড়ল।

বাইরে অঝোরধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে কান ফাটানো মেঘের গর্জন। ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে বৃষ্টি। মনে হচ্ছে, বৃষ্টি যেন এই জল-জঙ্গল, বিশ্বচরাচর সব কিছুকে ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। চৌকিতে শুয়ে সন্দীপ ভাবতে লাগল, ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রফেসর যে কথাটা বলে গেলেন সেই নিয়ে। কুমিরটা যে ইচ্ছে করেই সন্দীপের ক্ষতি করেনি তা তিনি জানলেন কী করে? কুমিরটা যেভাবে বারান্দায় ঘুরে বেরিয়েছে, এমনকী প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছে তা চিন্তা করে আর প্রফেসরের কথা শুনে সন্দীপের মনে হতে লাগল ওই কুমিরটার সঙ্গে প্রফেসরের কোনো সম্পর্ক আছে। তাহলে কি কুমিরটা প্রফেসরের পোষা? নইলে বাঘের সম্পর্কে প্রফেসর সন্দীপকে সাবধান করলেও কুমিরের ব্যাপারে সাবধান করেননি কেন! ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে। এরপরই সন্দীপের মনে প্রশ্ন উঁকি মারল প্রফেসরের গবেষণা নিয়ে। সে বিষয়ে এ ক-দিনের মধ্যে একবারও মুখ খুললেন না তিনি। বিশেষত এ ব্যাপারেই যখন তিনি সন্দীপকে এখানে ডেকে এনেছেন। তাহলে কি সন্দীপের কাছ থেকে কিছু গোপন করতে চাইছেন তিনি! সন্দীপের মনে পড়ে গেল প্রফেসরের নোটবুকে লেখাগুলোর কথা। কী তাৎপর্য ওই লেখাগুলোর? মুনি আর ইঁদুরের গল্পের উল্লেখ করলেন কেন প্রফেসর। বহু প্রচলিত ওই গল্পটা সকলের মতো সন্দীপও পড়েছে। তার বিষয়বস্তুর সংক্ষেপ হল এক মুনি ছোট্ট একটা ইঁদুরকে রূপান্তরিত করেছিলেন বাঘে। তারপর আবার তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন

BanglaBook.org

ইঁদুরে। প্রফেসর কেন নোটবুকের পাতায় ওই মুনিকে বিজ্ঞানী বলে মন্তব্য করেছেন! ওই গল্পের সঙ্গে প্রফেসরের গবেষণার কী সম্পর্ক আছে? তাহলে কি ধরে নিতে হবে ওই মুনির মতো প্রফেসরও পারেন...।

আর ভাবতে পারল না সন্দীপ। তার মাথার ভেতরটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কান-মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল তার। বিছানা থেকে উঠে জল নিয়ে মাথায় জলের ছিটে দিল। তারপর আবার চৌকিতে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘুম কিন্তু এল না তার। আবার সেই প্রশ্নগুলো তার মাথায় ভিড় করতে লাগল। এক সময় সন্দীপ বুঝতে পারল, প্রশ্নগুলো আর কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। তখন সে প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে এখানে আসার পর যেসব ঘটনা দেখেছে বা শুনেছে, সেগুলো পরপর সাজিয়ে নিয়ে সন্দীপ তার বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। বাইরে তখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে শুরু করেছে। কিন্তু বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই। ঘণ্টা তিনেক ভাববার পর একসময় সন্দীপের মাথার জট আস্তে আস্তে খুলে গেল। শেষ পর্যন্ত সন্দীপ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছল তা অবিশ্বাস্য। বিছানার ওপর উঠে বসল সন্দীপ। তারপর শুরু হল এক নতুন চিন্তা। যদি কোনো নতুন বিপদ তার সামনে আসে, তাহলে সে কীভাবে মোকাবিলা করবে? সন্দীপ বুঝতে পারল, এখন তার একমাত্র কর্তব্য হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। সেই চেষ্টাই করতে লাগল সে।

সন্ধে নাগাদ শেষে বৃষ্টি থামল। অন্ধকার ঘরে একইভাবে বসে আছে সন্দীপ। সারাদিন কিছুই খায়নি। তার খিদেও অনুভব হচ্ছে না। বাইরে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর শুরু হল একটা গুমোট ভাব। অন্ধকার ঘরের কোনায় খাঁচার মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু বাঘের বাচ্চাটার নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে সেদিকে তাকিয়ে সন্দীপের মনে হল, তাদের দুজনের অবস্থাই এখন একরকম। পার্থক্য একটাই। সন্দীপের খাঁচাটা আকারে বড়। এক সময় ঘরের ভেতরে গুমোট ভাবটা এত বেড়ে গেল যে, আর বসে থাকতে পারল না সন্দীপ। চৌকি ছেড়ে উঠে গিয়ে সে জানলাটা খুলে পাল্লাটা একটু ফাঁক করল। সঙ্গে সঙ্গে একঝলক ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগল। সে তাকাল বাইরের দিকে। আকাশে মেঘ কেটে গিয়েছে। প্রফেসর বলেছিলেন আজ পূর্ণিমা। আকাশে গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খাঁড়ি আর বাড়ির মাঝখানের জমিতে জল থইথই করছে। জোয়ারের জল খাঁড়ি ছাপিয়ে জমিতে ঢুকেছে। তার সঙ্গে মিশেছে বৃষ্টির জল। চাঁদের আলোয় সেই জল চিকচিক করছে। খাঁড়ির দিকের জমিটা বাড়ির অন্য দিকের জালে ঘেরা জমিটার তুলনায় অনেক নিচু। খাঁড়ির ওপারে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার জঙ্গল। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সন্দীপ। সারাদিন বদ্ধ ঘরের মধ্যে ছিল সে, ঠাণ্ডা বাতাসটা যেন তার

BanglaBook.org

মনপ্রাণ জুড়িয়ে দিল। দুশ্চিন্তাগুলোও যেন অনেকখানি মুছে গেল তার মন থেকে। এবার খিদে পেতে শুরু করল তার। ঘরে ভেতর আরও কয়েকটা ফল আছে। সন্দীপ ভাবল সেগুলো খেয়ে নেওয়া যাক। এই ভেবে সন্দীপ যখন জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই সে চাঁদের আলোয় দেখতে পেল খাঁড়ির দিক থেকে জলে ভাসতে ভাসতে কী যেন একটা বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই কুমিরটা নয় তো! বুকটা ধক করে উঠল সন্দীপের। হ্যাঁ, তার মনে হচ্ছে সেই কুমিরটাই। সন্দীপ সঙ্গে সঙ্গে জানলার পাল্লাটা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে খুব সামান্য ফাঁক করে রাখল। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। একসময় প্রাণীটা এসে হাজির হল বাড়িটার কাছে। তারপর সন্দীপের চোখের আড়ালে বারান্দার নীচে কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল প্রাণীটা। সম্ভবত কাঠের পাটাতন বেয়ে সে বারান্দার দিকে উঠতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, তার অনুমানই ঠিক। ভেজা কাঠের পাটাতনে তার শরীরের চাপে শব্দ হচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর তাকে দেখতে পেল সন্দীপ। সন্দীপের হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার এতক্ষণ ধরে ভাবলেও এতটা কল্পনা করেনি। সন্দীপের চোখের সামনে পাটাতন বেয়ে বুকে হেঁটে বারান্দায় উঠে এলেন প্রফেসর! তার শরীরে কোনো আচ্ছাদন নেই। জল ঝরছে গা দিয়ে। ওপরে উঠে আসার পর, মুহূর্তের জন্য থামলেন তিনি। তারপর সাপের মতো সামনের দুহাতে ভর দিয়ে বুক উঁচু করে ঘাড় বাঁকিয়ে একবার চাঁদের দিকে তাকালেন। ঠিক যেন লক্ষ কোটি বছর আগের কোনো আদিম প্রাণী। তারপর বুকে হেঁটে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

প্রফেসর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ এক জায়গায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সন্দীপ। তারপর জানলাটা কোনোরকমে বন্ধ করে চৌকিতে এসে বসল। তারকাছে কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। কেন তাঁর হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, কেন তার শরীরে আঁশটে গন্ধ, কেন বাড়ির ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়ির পরিবর্তে ঢালু পাটাতনের ব্যবস্থা। পরিষ্কার হয়ে গেল। কীভাবে প্রফেসর গুলিবিদ্ধ হলেন তাও বুঝতে পারল সন্দীপ। তার হাত-পা ক্রমে অবশ হয়ে আসতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। এভাবে বসে থাকলে সে আর বাঁচবে না। চৌকি ছেঁড়ে উঠে সন্দীপ একটা মোমবাতি জ্বালাল। তারপর একটু জল খেয়ে যখন সে চৌকিতে বসতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনতে পেল। প্রফেসর এসে গিয়েছেন। মনটা শক্ত করে দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল সন্দীপ।

৮

দরজা খুলে ঘরের ভেতরে কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল সন্দীপ। প্রফেসর তার গায়ের সেই আঁশটে গন্ধটা সঙ্গে নিয়ে পা রাখলেন ঘরের ভেতর। তার চুল থেকে জল

BanglaBook.org

ঝরছে এখনও। পরনে সেই খাকি পোশাক। তার এক হাতে তরল ভর্তি সেই ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ, আর অন্য হাতে ঝুলছে একটা লোহার খাঁচা। একটা তারখেল তার ভেতর। ঘরে ঢুকে প্রফেসর একবার সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?"

সন্দীপ নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে উত্তর দিল, "না।"

প্রফেসর টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "একটু আগে পর্যন্ত আমাকে ল্যাবরেটরিতে কাটাতে হল তাই তোমার ঘরে আসতে পারিনি।"

তার কথাটা যে মিথ্যে তা জানে সন্দীপ। সে কোনো উত্তর দিল না। প্রফেসর খাঁচাটা টেবিলের ওপর রাখলেন, সিরিঞ্জটাও সাবধানে খাঁচার পাশে নামিয়ে রাখলেন। চেয়ারটা সেখানে টেনে নিয়ে বসলেন প্রফেসর। সন্দীপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রফেসর সন্দীপকে বললেন, "তুমি দাঁড়িয়ে কেন! বোসো!"

সন্দীপ ধীরে ধীরে চৌকির এক কোনায় গিয়ে বসল। এরপর প্রফেসর কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সন্দীপের দিকে। সন্দীপও তাকাবার চেষ্টা করল তার চোখের দিকে। কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তেই কী একটা অস্বস্তিতে আবার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

প্রফেসর এবার সন্দীপকে বললেন, "তোমাকে ঠিক কেন এখানে ডেকে এনেছি, তা এখন বলব তোমাকে। তার আগে তোমাকে আমি একটা ম্যাজিক দেখাব। তুমি খাঁচার ভেতর রাখা তারখেলটার দিকে তাকাও।"

সন্দীপ তাকাল সেদিকে। খাঁচার ভেতর থেকে প্রাণীটা ঘাড় উঁচিয়ে ঘরের চারপাশ দেখছে আর মাঝে মাঝে তার জিভটা বাইরে বের করছে। সন্দীপ সেদিকে তাকাবার পর প্রফেসর ম্যাজিশিয়ানের ঢঙে বললেন, "খাঁচার ভেতর কী দেখছ, একটা নিরীহ তারখেল তো?"

সন্দীপ মাথা নেড়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

প্রফেসর একটু হেসে বললেন, "এবার দ্যাখো কী হয়!"

এই বলে প্রফেসর তাঁর জামার পকেট থেকে তরল ভর্তি একটা টেস্টটিউব বের করে তার ছিপিটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের তরল থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল গোটা ঘরে। এরপর তিনি বাঁ হাত দিয়ে খাঁচার দরজা খুলে তারখেলটাকে শক্ত হাতে চেপে ধরে বাইরে বের করে ডান হাত দিয়ে টেস্টটিউবের মুখটা চেপে ধরলেন তার নাকের কাছে। গ্যাসের তীব্র গন্ধে ছটফট করে উঠল প্রাণীটা। কিন্তু প্রফেসরের হাত থেকে সে মুক্ত হতে পারল না। প্রাণীটাকে কিছুক্ষণ এভাবে ধরে রাখার পর প্রফেসর তাকে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি সন্দীপকে বললেন, "এবার ভালো করে তাকিয়ে থাকো ওর দিকে।"

BanglaBook.org

সন্দীপ চুপচাপ চেয়ে রইল প্রাণীটার দিকে। খাঁচার ভেতর ছেড়ে দেওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত যেন নেতিয়ে রইল প্রাণীটা। তারপর হঠাৎ যেন তার দেহটা দুমড়েমুচড়ে যেতে লাগল। সন্দীপের চোখের সামনে ঘটতে লাগল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারখেলের শরীরের গঠন কেমন যেন পালটে যেতে লাগল। তার হলুদ রং কালো হয়ে গেল। পিঠের ওপর থেকে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জেগে উঠল খাঁজ। চোয়ালে জেগে উঠল সারি সারি দাঁত। উত্তেজনায় সন্দীপ চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোনো এক জাদুমন্ত্রে সন্দীপের চোখের সামনে তারখেলটা রূপান্তরিত হল ফুট চারেক লম্বা কুমিরে। খাঁচায় আর তার জায়গা ধরছে না। খাঁচার ভেতর থেকে সে একবার হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল সন্দীপের দিকে। তারপর মুক্তি পাওয়ার জন্য দাঁত দিয়ে খাঁচার জাল কাটবার চেষ্টা করতে লাগল। তার দাঁতের ঘষটানিতে একটা বিশ্রী খরখর শব্দ হতে শুরু হল। সন্দীপ এবার তাকাল প্রফেসরের মুখের দিকে। তার মুখে ফুটে উঠল আত্মবিশ্বাসের হাসি। প্রফেসর সন্দীপকে বললেন, "খাঁচার প্রাণীটাকে চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না তোমার? ও সুন্দরবনের বিখ্যাত মোহনার কুমির 'ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস'।"

সন্দীপ এতটা আশ্চর্য হয়ে গেল যে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। সে চৌকির ওপরে আবার বসে পড়ল। প্রফেসর খাঁচাটা টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোনায় রেখে আবার টেবিলের সামনে চেয়ারে এসে বসলেন। সন্দীপের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, "এতক্ষণ তুমি যা দেখলে তা ম্যাজিক নয়, বিজ্ঞানের খেলা। আমার সারা জীবনের সাধনার ফল। হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন মুনি ঋষিরা আয়ত্ত্ব করতে পেরেছিলেন এই বিজ্ঞান। যে কারণে তাঁরা এক প্রাণীকে অন্য প্রাণীতে পরিণত করতে পারতেন। তারপর কোনো কারণে মানুষ ভুলে যায় বিজ্ঞানের সেই কৌশল। তারই নতুন কৌশল রপ্ত করতে পেরেছি। তবে তুমি যা দেখলে তা একটি ছোট উদাহরণ মাত্র। এর চেয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটাতে পারি আমি।"

প্রফেসরের কথা শুনে হঠাৎ সন্দীপের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "এ তো অসম্ভব! এ কাজ কীভাবে করলেন আপনি।" তার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রফেসর আবার বলতে শুরু করলেন, "যদিও তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র নও। তবুও প্রশ্নটা যখন করলে তখন তোমাকে সরলভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। তুমি জান যে, আমি একজন জীববিজ্ঞানী। আমার দীর্ঘদিনের কাজের বিষয় বায়ো-টেকনোলজি। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। তুমি এটুকু নিশ্চয়ই জান যে কোনো জীবের শরীরই খুব ছোট এক অনুবীক্ষণিক একক দিয়ে তৈরি। যার নাম 'কোষ'। তার মধ্যে আছে এর চেয়ে আরও ছোট ছোট এক বস্তু। যার নাম 'জিন'। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দানব-জিনের চেয়েও অনেক ক্ষমতাধর এই জিন। কোনো প্রাণীর

BanglaBook.org

স্বভাব, আকার থেকে শুরু করে তার চরিত্রের গঠন পর্যন্ত ঠিক করে এই জিন নামের আশ্চর্য বস্তু। দীর্ঘদিন ধরে জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এক প্রাণীর গুণাবলী অন্য প্রাণীর মধ্যে আরোপ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জীববিজ্ঞানীরা। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা এ কাজে বেশ কিছুটা সাফল্য পেলেও প্রাণীবিজ্ঞানীরা এ কাজে এখনও পর্যন্ত বড় রকমের সাফল্যের মুখ দেখেননি। আমি এ কাজে শুধু সাফল্য পেয়েছি তাই নয়, আরও একটা ভয়ংকর অসাধ্যসাধন করেছি। এক জটিল পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত জিনকে প্রকট করে তুলতে সক্ষম হয়েছি। যদিও এই ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না। এর ফলে বিশেষ বিশেষ সময় যে প্রাণীর শরীরে জিন প্রতিস্থাপিত হয়, তার নিজস্ব অস্তিত্ব মুছে গিয়ে সে পরিণত হবে জিনের আসল মালিকে। তবে এর জন্য শুধু জিন প্রতিস্থাপন করলেই হবে না। প্রতিস্থাপিত জিনের আসল মালিকের শরীরের বেশ কিছু উপাদানও প্রতিস্থাপিত করতে হবে বা প্রবেশ করাতে হবে যার শরীরে জিন প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, তার শরীরে। ওই প্রতিস্থাপিত জিনকে জাগিয়ে তোলার চাবিকাঠি কী? এক্ষেত্রে আমি এক উপায় বের করেছি। যদি স্বাভাবিক নিয়মে বা কৃত্রিমভাবে গ্রহীতা প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলা যায়, তাহলে জেগে উঠবে ওই জিন। ঠিক যেমন তারখেলটাকে আমি কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে তাকে কুমিরে পরিণত করলাম। ওর শরীরে কুমিরের জিন ও কিছু শরীরী উপাদান প্রতিস্থাপিত করা আছে। অবশ্য স্বাভাবিক কোনো কারণে, অর্থাৎ ভয় পেলে বা রেগে গেলেও প্রাণীটার এই পরিবর্তন হতে পারত। আর মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা তার ইচ্ছেশক্তির ওপরে নির্ভর করবে।" এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেলেন প্রফেসর।

সন্দীপ এবার বুঝতে পারল কেন প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে কুমিরের বাচ্চাটা পরের দিন তারখেলে পরিণত হয়েছিল। আসলে সেটা তারখেলই ছিল। প্রথম দিন সন্দীপ ল্যাবরেটরিতে ঢোকার পর তাকে দেখে ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে সে পরিণত হয়েছিল কুমিরে।

প্রফেসর আবার বলতে শুরু করলেন, "এবার শোনো, তোমাকে আমি ডেকে এনেছি কেন? তোমার ওপর শেষ পরীক্ষা চালাতে চাই।"

সন্দীপ চমকে উঠে বলল, "মানে?"

প্রফেসর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সন্দীপের দিকে। তারপর বললেন, "মানে হল, তোমাকে আমি এক অমিত শক্তিধর প্রাণীতে রূপান্তরিত করতে চাই। ওই যে খাঁচার মধ্যে বাঘের বাচ্চাটা বসে আছে, ওর জিন, অর্থাৎ প্যানথেরা টাইগ্রিসের জিন আমি প্রতিস্থাপিত করতে চাই তোমার শরীরে।"

কথাটা শুনেই সন্দীপ চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন প্রফেসর? কী বলছেন আপনি?"

BanglaBook.org

প্রফেসর এবার টেবিল থেকে সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "তুমি ভয় পেয়ো না সন্দীপ। তোমাকে আমি পৃথিবীবিখ্যাত করে দেব একদিন। শুধু একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে তোমাকে। খুব সামান্য কষ্ট, ও কষ্ট আমিও সহ্য করেছি।"

সন্দীপ চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি বিখ্যাত হতে চাই না। এ কাজ আমি আপনাকে কিছুতেই করতে দেব না। আমি এখনই চলে যাব এখান থেকে।"

প্রফেসর তার কথা শুনে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আমি কিন্তু কাজটা এখনই শুরু করতে চাই।" এরপর তিনি একটু হেসে বললেন, "ইচ্ছে হলে অবশ্য তুমি এখন চলে যেতে পারো। কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? জঙ্গলে গেলে বাঘের পেটে যাবে আর জলে নামলে...।"

এ কথাটা আর শেষ করলেন না প্রফেসর। তারপর বললেন, "তার চেয়ে বরং আমার কথা মেনে নাও। আমাকে এখন কাজ করতে দাও। বাধা দিলে গুলি চালাতে বাধ্য হব। সন্দীপ আতঙ্কিত হয়ে দেখল প্রফেসরের বাঁ হাতে কোন ফাঁকে যেন উঠে এসেছে রিভলবার। তার মুখ সন্দীপের দিকে তাক করা। এক পা এক পা করে সন্দীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন প্রফেসর। তার বাঁ হাতে রিভলবার আর ডান হাতে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। ঠোঁটের কোনায় একটা কুটিল হাসি। সন্দীপ পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে। সন্দীপ বুঝতে পারছে না কীভাবে সে প্রতিরোধ করবে প্রফেসরকে। আর মাত্র হাত খানেকের ব্যবধান। প্রফেসরের হাতে ইঞ্জেকশনের সূচটা একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল মোমের আলোয়। ঠিক এই সময় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। প্রফেসর আর সন্দীপ দুজনই চমকে উঠে দেখল, দরজার পাল্লাটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে, আর সেখান দিয়ে উঁকি মারছে একটা প্রকাণ্ড বাঘের মাথা। না সে বাঘ নয়, সেই আহত বাঘিনী। সে এসেছে তার বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তার উপস্থিতি মনে হয় বাচ্চাটাও টের পেয়েছিল। খাঁচার ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ করে ডেকে উঠল সে। সেই শব্দ লক্ষ করে ঘরের ভেতর তাকাল বাঘিনী। তার চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বাঘিনী পা বাড়াল ঘরের ভেতর। প্রফেসর দু-এক মুহূর্তের জন্য স্থবির হয়ে গিয়েছিলেন তাকে দেখে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বাঘিনীকে লক্ষ্য করে তিনি চালিয়ে দিলেন গুলি। গুলিটা বাঘিনীর গায়ে লাগল কিনা বুঝতে পারল না সন্দীপ। একটা বিকট গর্জন করে সেই মুহূর্তে প্রফেসরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা তাণ্ডবে মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ঘরের সব কিছু। টেবিলটা উলটে মোমবাতিটা নিভে গিয়ে সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কীসের যেন আঘাতে সন্দীপও ছিটকে পড়ল ঘরের কোনায়। প্রফেসর আর বাঘিনী ঝটাপটি করতে করতে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দুজনে দলা পাকিয়ে বারান্দার কাঠের রেলিং

BanglaBook.org

ভেঙে নীচে গড়িয়ে পড়ল। নিচ থেকে ভেসে আসতে লাগল প্রবল ঝটাপটি আর ক্রুদ্ধ বাঘিনীর গর্জন। বাঘিনীটা যদি আবার ঘরের ভেতর ছুটে আসে? দরজার একটা পাল্লা তো ভেঙে পড়েছে, বাইরে পালাতে হবে, এই ভেবে সন্দীপ দ্রুত মেঝে থেকে উঠে ঘরের বাইরে পালাতে গেল। দরজার বাইরে পা রাখতেই সন্দীপের চোখে পড়ল বারান্দার মেঝেতে পড়ে আছে প্রফেসরের রিভলবারটা। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ সেটা কুড়িয়ে নিল। সেটা হাতে নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় হল তার মনে। কিন্তু সে এখন কোনদিকে পালাবে! হঠাৎ তার চোখ পড়ল বারান্দার নীচের দিকে জমিটায়। যেখানে বাঘে-মানুষে লড়াই চলছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পা যেন কেউ আটকে দিল মেঝের সঙ্গে। প্রফেসর কোথায়! চাঁদের আলোয় সন্দীপ স্পষ্ট দেখতে পেল, বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই করছে বিরাট বড় এক মোহনার কুমির! কুমিরের লেজের ঝাপট আর বাঘিনীর গর্জনে খানখান হয়ে যাচ্ছে অরণ্যের নিস্তব্ধতা। দুজনেই দুজনার গায়ে দাঁত বসাবার চেষ্টা করছে। শেষ লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছে জলের রাজা আর বনের রানি। আধ ঘণ্টা ধরে চলতে থাকল লড়াই। লড়তে লড়তে ক্রমশই তারা এগিয়ে যেতে শুরু করল খাঁড়ির দিকে।

বারান্দায় স্থবির হয়ে সন্দীপ তাকিয়ে রইল সেদিকে। জোয়ারের জল ক্রমশ বাড়ছে। খাঁড়ি ছাপিয়ে জমি পেরিয়ে বাড়ির তলা দিয়ে জল এগিয়ে আসছে লড়াইয়ের ময়দানের দিকে। একসময় তারা দুজনেই গিয়ে পড়ল সেই জলের মধ্যে। প্রচণ্ড লড়াইয়ে জল ছিটকে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল বাঘিনী। মোহনার কুমিরের বিরাট চোয়ালের মধ্যে আটকে পড়েছে বাঘিনীর গলা। সেই চোয়াল থেকে বাঘিনী আর মুক্ত করতে পারল না নিজেকে। ছটফট করতে করতে নিথর হয়ে গেল বাঘিনী। কুমিরটা বেশ কিছুক্ষণ কামড়ে ধরে রইল তাকে। মনে হয় নিশ্চিত হতে চাইল তার মৃত্যু সম্পর্কে। তারপর প্রচন্ড এক ঝটকায় অত বড় বাঘিনীর শরীরটা শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলল খাঁড়ির দিকের জলে। চাঁদের আলোয় অনেকটা জল ছিটকে উঠল আকাশের দিকে। খাঁড়ির জল বাঘিনীর শরীর ভাসিয়ে নিয়ে গেল সন্দীপের চোখের আড়ালে।

বিশাল কুমিরটা এরপর ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল বারান্দার দিকে। তারপর কিছুটা জলে ভেসে, কিছুটা বুকে হেঁটে দ্রুত এসে হাজির হল বারান্দায় ওঠার তক্তার সামনে। চাঁদের আলোয় সন্দীপ স্পষ্ট দেখতে পেল কুমিরটার পিঠের ওপর লেগে আছে প্রফেসরের খাকি রঙের জামার একটা টুকরো। তক্তা বেয়ে কুমিরটা ওপরে ওঠার জন্য আরও কিছুটা এগিয়ে এল। ওকে ওপরে উঠতে দেওয়া যাবে না। মনের সব শক্তি সঞ্চয় করে সন্দীপ ছুটে গিয়ে দাঁড়াল তক্তাটা বারান্দার যে জায়গাটা থেকে নীচে নেমেছে সেখানে। সন্দীপ চিৎকার করে বলল, "প্রফেসর, ওপরে ওঠার চেষ্টা করবেন না। আমি কিন্তু গুলি চালাব।"

BanglaBook.org

থমকে গেল কুমিরটা। তারপর সন্দীপকে ভয় দেখানোর জন্যই মনে হয় তার দিকে তাকিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাঁ করল। চাঁদের আলোয় সন্দীপ দেখতে পেল তার বিশাল মুখের মধ্যে চোয়ালে সাজানো সারি সারি ভয়ংকর দাঁত। নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি! আতঙ্কে শিউরে উঠল সন্দীপ। নিজের অজান্তেই তার হাতের রিভলবার থেকে প্রচণ্ড শব্দে ছিটকে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। সেই গুলি কুমিরটার গায়ে লাগল না ঠিকই, কিন্তু সে একটু পিছু হটে দাঁড়াল। সন্দীপ দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার ওপর আর কুমিরটা পাটাতনের নীচে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে যেন ধৈর্যের পরীক্ষায় নেমেছে। কেটে যেতে লাগল সময়। খাঁড়ির জল একসময় গ্রাস করে নিল সামনের জমিটা। জলে ঢেকে গেল প্রাণীটার শরীর। শুধু জেগে রইল তার পিঠের খাঁজকাটা অংশ আর এক জোড়া ড্যাবড্যাবে চোখ। সারা রাত সেই চোখের দিকে তাকিয়ে সন্দীপ হাতের রিভলবারটা তাক করে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো। বিশ্ব চরাচরের সব কিছু সন্দীপের চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। ওই দুটো ভাসমান চোখ ছাড়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। শেষরাতের দিকে নেমে গেল বানের জল। আবার ফুটে উঠতে লাগল তার শরীরের স্পষ্ট অবয়ব। একসময় পুবের আকাশ যেন লাল হতে শুরু করল। ঠিক এই সময় ওপরে ওঠার জন্য শেষ চেষ্টা করল কুমিরটা। সে এগিয়ে এল তক্তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাল সন্দীপ। সচেতনভাবেই সে চালাল। কিন্তু তার অপটু হাতের জন্য গুলি এবারও লাগল না। এবার মনে হল সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে কুমিরটা। অনেকটা পিছু হটে, তারপর মাটির ওপর আস্তে আস্তে লেজের ঝাপটা মারতে লাগল। একসময় আলো ফুটতে শুরু করল। কুমিরটা শেষবারের মতো বিরাট হাঁ করল। তার পর সড়সড় করে এগিয়ে গেল খাঁড়ির দিকে। সন্দীপও খাঁড়ির দিকের বারান্দায় দাঁড়াল। খাঁড়ির পারটা কুয়াশা মাখানো। কুমিরটা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে মুহূর্তের জন্য ঘাড় ফেরাল বাড়িটার দিকে। তারপর অদৃশ্য হল খাঁড়ির পারে কুয়াশার মধ্যে। কুমিরটার জলে ঝাঁপ দেওয়ার অস্পষ্ট শব্দ কানে এল সন্দীপের। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শুনতে পেল দিনের প্রথম পাখির ডাক।

সকাল সাতটা নাগাদ বন দপ্তরের লোক যখন বাড়িটার সামনে হাজির হল তখনও বারান্দায় একইভাবে দাঁড়িয়ে সন্দীপ। আসলে তারা ঘটনাচক্রে কাল রাতে এসে নোঙর ফেলেছিল কাছের এক বড় খাঁড়িতে। চোরাশিকারীদের ধরার জন্য মাঝে মাঝে তারা এরকম গভীর জঙ্গলের মধ্যে লঞ্চ নোঙর করে। মাঝরাতে তারা শুনেছে বাঘের গর্জন আর গুলির শব্দ। তাই ভোর হতেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল শব্দের উৎসের খোঁজে। তারপর পৌঁছেছিল বাড়ির সামনে। সন্দীপকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল তারা। সন্দীপ তাদের খুলে বলল কীভাবে সে সেখানে এসে হাজির হয়েছে। বলল, বাঘিনী আর

BanglaBook.org

কুমিরের লড়াইয়ের ঘটনা। শুধু বলল না তার আসল অভিজ্ঞতার কথা। কারণ, সেকথা কেউ বিশ্বাস করত না। বনদপ্তরের যে অফিসার দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি কীভাবে যেন চিনতেন প্রফেসরকে। প্রফেসর যে সুন্দরবনেরই কোনো অঞ্চলে থাকেন একথাও তিনি জানতেন। কাজেই সন্দীপের পক্ষে কথাগুলো তাদের বিশ্বাস করানো সহজ হল। বাড়ির সামনের জমির কাদামাটিতে কুমির আর বাঘিনীর পায়ের ছাপ আর তাদের লড়াইয়ের চিহ্ন। খাঁড়ির পারে পরে থাকা বাঘিনীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ সন্দীপের বক্তব্যের সাক্ষ্য দিল। প্রফেসর কোথায়? তাঁরা জিজ্ঞেস করতে সন্দীপ বলল, "প্রফেসরকে কুমিরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

বন দপ্তরের লঞ্চ এখন সন্দীপকে নিয়ে চোরাগাজি খাল বেয়ে এগিয়ে চলেছিল সজনেখালির দিকে। সূর্য মাথার ওপর। লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সন্দীপ তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। আরও দুজন লোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। তাদের কথাবার্তা টুকরো টুকরো কানে আসছিল সন্দীপের। হঠাৎ তাদের একজন আর একজনকে বলল, "চোরাগাজি খালের চরে যে বিরাট কুমিরটা রোদ পোয়ায় সেটাকে কদিন ধরে দেখছি না কেন?"

অন্য একজন তার কথা শুনে উত্তর দিল, "কী জানি, মোহনার দিকে চলে গিয়েছে হয়তো।"

সন্দীপের মনে পড়ে গেল প্রফেসরের সেই কথা, "কাল আমি চোরাগাজি খালে তোমাকে দেখেছি।" কথাটা মনে পড়তেই সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার নীচে জলের মধ্যে একটা শব্দ হল। সন্দীপের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা লম্বা কালো মাথা। আর তাতে বসানো একজোড়া ড্যাবড্যাবে চোখ। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সন্দীপের দিকে। সন্দীপ চিৎকার করে বলে উঠল, "ওই যে! ওই যে!"

তার কথা শুনে কাছে থাকা লোক দুটি চমকে উঠে সন্দীপের পাশে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে সে ডুব দিয়েছে জলের গভীরে। তাদের একজন সন্দীপকে প্রশ্ন করল, "কী?"

সন্দীপ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "একটা কুমির।"

তার কথা শুনে লোকটি একটু নিরাশ হয়ে বলল, "আমি ভাবলাম আপনি নদীর চরে জঙ্গলে বাঘ দেখলেন বুঝি! কুমির তো আমরা হামেশাই দেখি সুন্দরবনের খাঁড়িতে।"

BanglaBook.org

তেজকাৎলিপোকার পিরামিড

তিওতিহুকান পিরামিড চত্বরের এক পাশে একটা ফাঁকা জায়গাতে পাথরের বেঞ্চে বসে ছিলাম আমি আর প্রফেসর জুয়ান। মেক্সিকো সিটি থেকে আজই আমরা পিরামিড নগরী তিওতিহুকানে পৌঁছেছি এখানকার ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলো দেখব বলে। তিওতিহুকান শব্দের অর্থ,'যে পবিত্র স্থানে মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে।' এ নগরী তৈরি হয়েছিল একশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাতশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। এ শহরের প্রাচীন স্থপতিদের সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তাদের কাছ থেকে পরবর্তীকালে এ নগরীর দখল নেয় অ্যাজটেকরা। সেও প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। অ্যাজটেকরা নিজেদের স্থাপত্যশৈলীতে সাজিয়ে নেয় এই নগরীকে। যার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশের স্তম্ভ, মিনার, পিরামিডের গায়ে।

প্রায় দুপুর হতে চলেছে। পিরামিড চত্বরে ভিনদেশি ট্যুরিস্টদের বেশ ভিড়। সিঁড়ি বেয়ে পিরামিডের ওপরে ওঠানামা করছে লোকজন। নীচের চত্বরে মাথায় বিরাট পালকের টুপিওয়ালা প্রাচীন অ্যাজটেক যোদ্ধার সাজে সজ্জিত কিছু লোক বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জন করছে। তাদের সঙ্গে ছবি তুলছে ট্যুরিস্টরা। তিওতিহুকান পিরামিড দেখে জিরিয়ে নিচ্ছি আমরা। প্রফেসর মেসো-আমেরিকান সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমাকে। মেক্সিকোতে আমি প্রথমবার এলেও টোলটেক-অ্যাজটেক সভ্যতার ভিত্তিভূমিতে প্রফেসর তার পুরাতাত্ত্বিক জ্ঞান সংগ্রহের কারণে বার কয়েক এসেছেন। প্রবীণ প্রফেসর তাঁর স্বদেশ স্পেনের ক্যানারি ইউনিভার্সিটিতে মেসো-আমেরিকান সভ্যতার ইতিহাস পড়ান। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আমরা যে জায়গাতে বসে আছি তার কাছের একটা প্রাচীন স্তম্ভগাত্রে একটা ঈগল মূর্তি খোদিত। সেটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'শোন, অ্যাজটেক সভ্যতার যে কোনো স্থাপত্যের গায়ে তুমি অন্তত একটা ঈগলের মূর্তি দেখতে পাবে।'

আমার নাম দীপাঞ্জন সেন। খাঁটি বাঙালি নাম-পদবি। প্রফেসরের স্পেনীয় জিভে

BanglaBook.org

আমার নামটা জড়িয়ে যায়, আর 'সেন'-টা হয়ে যায় 'শেন'। আমি তাঁর কথা শুনে বললাম, "এর কারণ?"

জুয়ান বললেন, "এই ইগল হল অ্যাজটেকদের জাত্যাভিমানের প্রতীক। পৃথিবীর সব জাতির উৎপত্তির পিছনে দেখবে একটা করে দৈব কাহিনী আছে। যাকে বলে 'মায়া কাহিনী'। অ্যাজটেকদের মায়া কাহিনী অনুসারে বহু শতাব্দী পূর্বে তারা 'আজৎলান' নামে এক উষর মরু অঞ্চলে 'নাহুয়া উপজাতি' পরিচয়ে অতি কষ্টে বাস করত। একদিন তারা আকাশ থেকে দেবতা 'হুইৎজিলোপোকৎলি'র কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তোমরা এ মরু অঞ্চল ছেড়ে সূর্যোদয়ের দিকে যাত্রা করো। যেতে যেতে একদিন তোমরা দেখবে একটা ক্যাকটাস গাছের মাথায় এক বিশাল ইগল বসে আছে। তার নখের ধারে এক অজগর সর্প। সর্পের দুই মুখ, এক মুখে বৃষ্টি, অন্য মুখে বজ্র। সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক ওই দুই মুখ। যেখানে তোমরা ওই ইগল দেখবে সেখানে বসতি স্থাপন করবে তোমরা। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কেউ যদি তোমাদের পরিচয় জানতে চায়, বলবে, আমরা 'মেকসিকা', আর বসতি স্থাপন করলে বলবে , 'আমরা অ্যাজটেক'। দেবতার কথামতো বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘ যাত্রা শেষে এইখানেই নাকি ইগল দেখে বসত করতে লাগল মানুষেরা। ঐতিহাসিকদের মতে, এই ভূমিতে তাদের আগমনের সময়কাল ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ। তারপর থেকে ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় অভিযাত্রী হার্নান্দো কর্তেজের মেক্সিকো বিজয়ের আগে পর্যন্ত এখানে ছিল লাল মানুষের সাম্রাজ্য। সে সময়কালের মধ্যে অ্যাজটেকরা তাদের কয়েক হাজার মাইল ব্যাপী সাম্রাজ্য জুড়ে গড়ে তুলেছিল অসংখ্য পিরামিড, মন্দির, এইসব স্থাপত্য। আর তাদের গায়ে খোদিত ছিল পবিত্র ইগলের মূর্তি।

প্রফেসর জুয়ান এরপর কী যেন আরও বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমাদের কানে এল এক পরিচিত শব্দ—'ওলা?' স্প্যানিশ ভাষায় এই শব্দের অর্থ হল, 'হ্যালো?' শব্দটা কানে যেতেই তাকিয়ে দেখি, আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বছর দশেকের একটা বাচ্চা ছেলে। তার পরনে মেসো ইন্ডিয়ানদের বিবর্ণ পোশাক, খালি পা, মাথায় ঘাসের দড়িতে বোনা পালক গোঁজা টুপি। তবে তার পোশাক বিবর্ণ হলেও বড় বড় চোখদুটোতে একটা ঔজ্জ্বল্য আছে।

আমরা তার উদ্দেশে 'ওলা' বলতেই সে একটু ইতস্তত করে বলল, "তোমাদের কাছে খাবার আছে? খুব খিদে পেয়েছে আমার।" ভিখিরি বলতে যা বোঝায় তা এ চত্বরে আমাদের চোখে পড়েনি। ছেলেটার পোশাক বিবর্ণ হলেও তাকে ঠিক ওই গোত্রের বলে মনে হচ্ছে না। জুয়ান জবাব দিলেন, "না, খাবার তো আমাদের সঙ্গে নেই। তবে কয়েকটা পেসো তোমাকে দিতে পারি খাবার কেনার জন্য।"

"পেসো?" এই বলে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে ছেলেটা বলল, "কিন্তু আমার কাছে তেমন কিছু নেই। পেসোর বদলে কী দেব তোমাকে?"

BanglaBook.org

জুয়ান হেসে বললেন, "তোমাকে কিছু দিতে হবে না। আমি এমনিই দিচ্ছি তোমাকে।" এই বলে পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে এগিয়ে দিলেন বাচ্চাটার দিকে।

ছেলেটার প্রথমে পয়সাগুলো কিন্তু নিল না। অস্পষ্ট স্বরে সে বলল, "আমি কিন্তু ভিখারি নই। আমি একজনের সঙ্গে এখানে এসেছি। তাকে কোথায় যে বসিয়ে রাখলাম খুঁজে পাচ্ছি না! এদিকে আমার খুব খিদে পাচ্ছে।"

আমি এবার বললাম, "বুঝলাম তুমি ভিখারি নও। তবে খিদে যখন পাচ্ছে তখন পয়সাটা নাও। ওই তো চত্বরের ওপাশে খাবার বিক্রি হচ্ছে।" ছেলেটা আবার কিছুক্ষণ যেন কী ভাবল, তারপর জুয়ানের হাত থেকে পেসোগুলো নিয়ে তার জামার তলা থেকে লম্বা দণ্ডের মতো একটা কাগজের মোড়ক বার করে পাথরের বেঞ্চে নামিয়ে রেখে বলল, "এটা তোমরা রাখো। যাকে খুঁজছি, সে এখানেই কোথাও আছে। তাকে খুঁজে পেসো ফেরত দিয়ে এটা নিয়ে যাবখন।"

জুয়ান বললেন, "না না এসবের দরকার নেই। বললাম তো তোমাকে এমনি দিলাম পয়সাগুলো।"

ছেলেটা জবাব দিল, "পয়সা নিলে সে যদি আমাকে বকে?" এই বলে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি মোলায়েম স্বরে তার উদ্দেশে এবার বললাম, "তোমার বাড়ি কোথায়? কার সঙ্গে এখানে এসেছ তুমি?"

ছেলেটা শুধু জবাব দিল, "যেখানে তেজকাৎলিপোকার মন্দির আছে সেখানে।" এরপরই হঠাৎ চত্বরের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ছেলেটা, সে সোজা ছুটতে লাগল সেদিকে, তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

তার ওই কাণ্ড দেখে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা মনে করলাম সে বুঝি তার সঙ্গীকে দেখতে পেয়েছে। আমরা তার প্রতীক্ষা করতে করতে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মন দিলাম। আমরা মেক্সিকোতে আরও পাঁচদিন থাকব। তার মধ্যে কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরও যখন ছেলেটা ফিরে এল না তখন জুয়ান বললেন, "চলো, আমাদের তো হোটেলে ফিরতে হবে। ছেলেটাকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে ওর জিনিসটা ফিরিয়ে দিই।"

কাগজের মোড়কটা উঠিয়ে নিলাম আমি, তারপর দুজনে এগোলাম ভিড়ের দিকে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে বেশ অনেকক্ষণ খোঁজার পরও চত্বর বা তার আশেপাশে কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না আমরা। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। পিরামিডে ওঠানামা করতে গিয়ে বেশ খিদেও পেয়ে গেছে দুজনেরই। জুয়ান বললেন, "ছেলেটা আমাদের জিনিসটা গছিয়ে দিয়ে বেশ মুশকিলে ফেলল দেখছি। কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করব? কী করা যায় বলো তো?"

BanglaBook.org

আমারও আর খিদের জ্বালায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। চত্বরের ওপাশে রাস্তার ওপারে একটা গলির মধ্যে আমাদের হোটেল। বেশি দূর নয়। আমি তাই বললাম, "চলুন আমরা হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি। ছেলেটাও এখানে আমাদের না পেলে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।"

জুয়ান বললেন, "ঠিক আছে, তাই করা যাক।"

আমরা রওনা দিলাম হোটেলের দিকে।

২

গলির মধ্যে একটা ছোট্ট হোটেলে ঘরভাড়া নিয়েছি আমরা, নাম—'মনতেজুমা।' জুয়ান বলেছেন, 'মনতেজুমা' নাকি এক অ্যাজটেক সম্রাটের নাম। এ নামের অর্থ বড় অদ্ভুত, 'যে দেবতা ভ্রুকুটি করেন'! যাইহোক মনতেজুমাতে নিজেদের ঘরে ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাবার চলে এল। 'সালভাতোর কোয়েসাদিল্লা'—চিজে মোড়া রুটি, 'আগুয়ামিল'—হনি ওয়াটার আর চিকেন রোস্ট। খিদের কারণে বেশ তৃপ্তি সহকারে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করলাম আমরা।

খাবার পর জুয়ান খাটে শুয়ে পড়ে বললেন, "দাঁড়াও, বাইরে যাবার আগে মিনিট দশেক গড়িয়ে নিই। বাইরে বেরোবার পর একেবারে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরব।" এই বলে তিনি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন, আর আমি একটা চেয়ারে বসে মন দিলাম ট্যুরিস্ট গাইডবুকে।

একটু পরে প্রফেসর বললেন, "কাগজের মোড়কটার মধ্যে কী থাকতে পারে বলো তো?"

মোড়কটা খাটের ওপরই রাখা আছে। আমি বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বললাম, "কোনো গৃহস্থালির মামুলি জিনিস বা ওই জাতীয় কোনো কিছু হবে।"

বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই এরপর মৃদু খসখস শব্দ শুনে আমি বুঝতে পারলাম জুয়ান সম্ভবত মোড়কটা নিয়ে দেখছেন। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপরই বেশ জোরে জুয়ানের গলায় একটা বিস্ময়সূচক শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি জুয়ান খাটের ওপর উঠে বসে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁর হাতে ধরা একটা পাথরের ছুরির দিকে। মোড়কের মধ্যেই ছিল জিনিসটা।

আমি আগ্রহী হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রফেসর বিস্মিত হয়ে বললেন, "এই দুর্মূল্য জিনিস ছেলেটা কোথায় পেল। এটা কী তুমি জান?" তাঁর হাত থেকে ছুরিটা হাতে নিয়ে দেখলাম আমি। এক ফুট মতো লম্বা তীক্ষ্ণ একটা পাথরের ছুরি। ফলার দু-পাশে সাপের ছবি খোদাই করা আছে। তবে জিনিসটা যে প্রাচীন তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমি ছুরিটা

BanglaBook.org

ভালো করে দেখার পর জুয়ানের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লাম। তিনি ছুরিটা হাতে নিয়ে বিস্মিত স্বরে বললেন, "এটা দুর্মূল্য অ্যান্টিক—ফ্লিন্ট পাথরের ছুরি। হুবহু এরকম একটা ছুরি আমি স্পেনের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে দেখেছি। তুমি হয়তো জান যে অ্যাজটেকদের সময় দেবতার উদ্দেশে নরবলি দেওয়া স্বাভাবিক ও আবশ্যিক ব্যাপার ছিল। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ লোককে বলি দেওয়া হত। পিরামিড মন্দিরগুলো সব সময় বলির রক্তে পিচ্ছিল থাকত। এই ফ্লিন্ট পাথরের ছুরি দিয়ে পিরামিডের মাথায় দাঁড়িয়ে নীচে দাঁড়ানো হাজার জনতার সামনে বলি দেওয়া হত। হতভাগ্য বন্দিকে বেদিতে প্রথমে শুইয়ে এই ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে অ্যাজটেক পুরোহিত তার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিঁড়ে আনতেন তখনও কম্পমান হৃৎপিণ্ড। সেই হৃৎপিণ্ড পুড়িয়ে নিবেদন করা হত বিগ্রহর সামনে, আর মৃতদেহটাকে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হত নীচে অপেক্ষারত জনতার উদ্দেশে। মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত সেই দেহ। বলির পবিত্র মাংস ভক্ষণের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত অ্যাজটেকদের মধ্যে। এ ছুরির গায়েও কত মানুষের অদৃশ্য রক্ত লেগে আছে কে জানে! এছাড়া এ ছুরি দিয়ে বলিপ্রদত্ত মেয়েদের চামড়া ছাড়িয়ে সে চামড়া গায়ে পড়ত অ্যাজটেক পুরোহিতরা। এরকম অনেক বীভৎস কাণ্ড করা হত এই ছুরি দিয়ে!"

জুয়ানের কথা শুনে আমি শিহরিত হয়ে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, "এসব ঘটনা কি সত্যিই? নাকি গল্পকথা?"

জুয়ান চটপট ছুরিটা কাগজে মুড়তে মুড়তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "না, গল্পকথা নয়, ঐতিহাসিক সত্যি। চলো যেতে যেতে বলছি। এটা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। জিনিসটা হয়তো অন্য কারওর। কোনোভাবে বাচ্চাটার হাতে এসে পড়েছে।"

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে চত্বরের দিকে এগোতে এগোতে তিনি বললেন, "অ্যাজটেকদের এই জঘন্যতম ও ঘৃণ্য ব্যাপারটা একদম সত্যি ছিল। মেক্সিকো বিজয়ী কর্তেজ ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের সম্রাটদের উদ্দেশে পাঠানো প্রথম পত্রেই এ বিষয়ে তাঁকে অবগত করেছিলেন। এরপর তাঁর প্রতি চিঠিতে নরবলির ঘটনা স্থান পেয়েছে। তার অভিযানের সঙ্গী ঐতিহাসিক বার্নাল দিয়াজ ইনকাটান অঞ্চলে প্রথম অভিযান থেকে তৃতীয় অভিযানে তেনোকতিতলান অর্থাৎ মেক্সিকো নগরী পৌঁছনোর পথে প্রত্যেক ছোট-বড় গ্রাম-শহর-নগরে অসংখ্য নরমুণ্ড ও সদ্য বলি দেওয়া দেহ দেখতে পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক দুরান ও সাহাগুনের মতে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বিখ্যাত তেনোকতিতলান পিরামিড নির্মাণ করা হয় তখন চার দিনে আশি হাজার নরবলি দেওয়া হয়। 'The Enigma of Aztec Sacrifice' নামের বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা মাইকেল হার্নারের মতে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতি বছর অ্যাজটেকরা আড়াই লাখ নরবলি দিত। প্রতি পরিবার থেকে এজন্য একজন সদস্যকে নিয়ে যাওয়া হত। এমনকী এক অ্যাজটেক সম্রাট নিজের মেয়েকেও বলি দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

এমনই ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার ও দেবতার প্রতি অ্যাজটেকদের ভয়। তারা মনে করত যে, দেবদেবীরা মানবের প্রাণসঞ্চার করেছেন, অতএব, তাদের রক্ততৃষ্ণা মেটাতে না পারলে ফসল ফলবে না, ধ্বংস হবে মানব জাতি...”

প্রফেসরের কথা শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম পিরামিড চত্বরে। বেলা পড়তে শুরু করেছে। লোকজন কমছে। চত্বরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যুরিষ্ট বাসগুলো একে একে পাড়ি জমাচ্ছে অন্যত্র। আমরা খুঁজতে শুরু করলাম ছেলেটাকে। পিরামিড ও তার আশেপাশে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজার পরও যখন তাকে পাওয়া গেল না তখন জুয়ান বললেন, “আমরা বরং সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসি। ছেলেটা এখানে এলে ওখানে নিশ্চয়ই খুঁজবে আমাদের।” আমরা এগোলাম সেদিকে।

অনেকক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি পাথরের বেঞ্চে। দিনান্তের সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচীর পিরামিডের মাথায়। অনেক দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা খণ্ডহর স্মারকগুলোর গায়ে। পিরামিডের ছায়া এসে স্পর্শ করেছে আমাদের পা। পিরামিডের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন কত সূর্যাস্ত-সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করেছে এই পিরামিড! দেখেছে কত সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়া! দেখেছে পরাক্রান্ত অ্যাজটেকদের সম্রাটদের, আবার দেখেছে স্পেনীয়ার্ডদের ক্ষুরধার তরবারির নীচে ধুলোতে গড়াগড়ি যাচ্ছে মর্ত্যের ভগবান অ্যাজটেক সম্রাটের কাটা মুণ্ডু ! কত জন্ম, কত মৃত্যু! মহাকালের প্রহরী এই পিরামিডের তুলনায় আমাদের মানবজীবন সত্যিই কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়...।

“ছেলেটা কি আর আসবে না? এটা নিয়ে কী করা যায় বলো তো? এই জায়গা দেখা তো আমাদের শেষ। কাল তো অন্য কোনো দিকে বেরিয়ে পড়ব আমরা।”

প্রফেসরের কথায় চিন্তাজাল ছিন্ন হল আমার। আমি বললাম, “পুলিশ বা কোনো মিউজিয়ামে এটা জমা দিয়ে দিলে হয় না?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তা হয়। তবে তা হলে বাচ্চাটার ভুলে এই অমূল্য জিনিসটা প্রকৃত মালিকের হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে আর এটা ফেরত পাবে না।”

তিনি এরপর আরও কী বলতে গিয়ে সামনে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি ইউরোপীয় পোশাক পড়া দীর্ঘদেহি এক ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের একদম কাছে এগিয়ে আসছেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়াতেই তার দিকে তাকাতে বুঝতে পারলাম মেসো-আমেরিকান রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার ধমনীতে। টিকালো নাক, লম্বা কানের গঠন, বেশ একটা ধারালো ভাব আছে চোখেমুখে। শক্ত গড়ন, বয়স মনে হয় পঞ্চাশ হবে। তবে যে জিনিসটা আমার তার চেহারাতে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হল তার কালো পোশাকের বাঁ হাতের হাতাটা। ভদ্রলোকের বাঁ হাতটা বোধহয় কবজির কাছ থেকে নেই।

BanglaBook.org

ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্মিত হেসে বললেন, "আপনারা তো ট্যুরিস্ট। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন দেখছি। কারওর জন্য প্রতীক্ষা করছেন? আমি কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি?"

জোয়ানের কোটের ভিতরে মোড়কটা রাখা। আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে তিনি বললেন, "আমাদের পিরামিড দেখা হয়ে গেছে। চত্বরের ওপাশে কাছেই আমাদের হোটেল। তাই এখানে বসে গল্প করছি। তা আপনার পরিচয়টা?"

আগন্তুক তাঁর বুকপকেট থেকে একটা আইকার্ড বের করে জুয়ানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার নাম কমোলোৎল। স্থানীয় মনতেজুমা কলেজের ইতিহাস বিভাগে আমন্ত্রিত অধ্যাপক রূপে প্রাচীন অ্যাজটেক ধর্মচেতনা বিষয়ে পাঠদান করি। তা ছাড়া প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আমার একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। এখানে বহু দেশ থেকে পর্যটক আসে তো, তাদের কোনো অসুবিধা হলে বিনা পারিশ্রমিকে আমরা তাদের সাহায্য করি।"

জুয়ান তাঁর আইকার্ডটা দেখে আর তাঁর পরিচয় জেনে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, "আপনি ইতিহাস চর্চা করেন জেনে ভালো লাগল। আমিও ওই কাজ করি।" আমিও করমর্দন করলাম আগন্তুকের সঙ্গে।

মিস্টার কমোলোৎল এবার বললেন, "আপনাদের পরিচয়টা? কোথা থেকে আসছেন?" বেশ বিনম্রস্বরে কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক।

জুয়ান জবাব দিলেন, "আমি প্রফেসর জুয়ান—স্পেনের গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। আর আমার সঙ্গী শেন হল ইন্ডিয়ান ও ইকলোজি নিয়ে কাজ করে। আমরা মেক্সিকো সিটিতে ইউনেস্কোর একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে এসেছিলাম, তারপর দুজনে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছি! ঝাঁ চকচকে মেক্সিকো সিটিতে আমাদের আগ্রহ নেই। প্রাচীন দ্রষ্টব্যগুলো দেখতে চাই। পরিচিত হতে চাই স্থানীয় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে।"

"এখন পর্যন্ত কী কী দেখলেন?" প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

প্রফেসর বললেন, "খুব বেশি কিছু নয়। কাল তেনোকতিতলান পিরামিড দেখে মেক্সিকো সিটি থেকে আজই তিওতিহুকানে এসে পৌঁছেছি। আপনি নিশ্চয়ই এ তল্লাটের অনেক কিছু জানেন। এরপর কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? কয়েকটা দিন হাতে সময় আছে আমাদের।" কমোলোৎল বললেন, "একটা চালু প্রবাদ আছে, আপনারা হয়তো জানেন, মেক্সিকো ভূমিতে জনসংখ্যার চেয়ে অ্যাজটেক মন্দিরের সংখ্যা বেশি। তবে একটা জায়গার কথা বলতে পারি আপনাদের। এখান থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে তেজকাৎলিপোকার পিরামিড আছে। ও জায়গাতে যারা বাস করে, খাঁটি অ্যাজটেক রক্ত তাদের দেহে। জীবনযাত্রাও প্রাচীন। এই মন্দিরের চত্বরে যারা সাজপোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মতো মেকি তারা নয়। ও জায়গা ঘুরে আসতে পারলে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।"

BanglaBook.org

তেজকাৎলিপোকার কথা শুনে একটু চমকে উঠলাম আমি। মনে হয় জুয়ানও চমকালেন। বাচ্চা ছেলেটা বলেছিল ওইখানেই ওর বাড়ি! জুয়ান শুনে উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ও জায়গাতে কীভাবে যেতে হয় বলুন তো?"

ভদ্রলোক বললেন, "ওটা মরুভূমি অঞ্চল। সাধারণত ট্যুরিস্ট গাড়ি বা অন্য কোনো গাড়ি ওদিকে যায় না। তবে আপনারা আগ্রহী হলে একটা ব্যবস্থা করতে পারি।" এরপর একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, "আমি আমার সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে কাল একটা গাড়িতে রওনা দেব। পরশু একটা ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিতে। তার পরের দিন আবার এখানে ফিরে আসব। আপনার চাইলে দুজনের জায়গা হয়ে যাবে গাড়িতে। অবশ্য আপনারা যদি আমার মতো একজন অপরিচিত প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে যেতে রাজি হন।"

এই বলে তিনি নম্রভাবে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন আমাদের দিকে।

জুয়ান একটু লজ্জিতভাবে বললেন, "না, না, এভাবে বলছেন কেন? এ তো একটা বিরাট সুযোগ! তবে একটু ভাবতে চাই আমরা। আমরা মনতেজুমাতে উঠেছি। আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা যায় বলুন তো?"

কমোলোৎল বললেন, "কাল ভোরেই রওনা দেব আমরা। আমি না হয় রাত ন-টা নাগাদ আপনাদের হোটেলে গিয়ে সিদ্ধান্ত জেনে আসব। আগ্রহী পর্যটক দেখলে আমার ভালো লাগে তাই প্রস্তাবটা দিলাম। ঠকবেন না আপনারা। টোলটেক সভ্যতারও নির্দশন আছে সেখানে, আর আছে পাথরে খোদিত প্রাচীনতম এক অ্যাজটেক ক্যালেন্ডার ও সূর্য ঘড়ি। ওখানকার জীবনযাত্রা ওই ক্যালেন্ডার মেনে চলে।"

এরপর ভদ্রলোকের কথামতোই ঠিক হল যে রাতে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। চত্বরের মধ্যে দিয়ে তিনি বড়রাস্তার দিকে এগোলেন। চত্বর প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়।

তিনি চলে যাবার পর জুয়ান বললেন, "ওর প্রস্তাবটা লোভনীয়। তবে মুশকিলটা তো হল এই ছুরিটা নিয়ে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো আপাতত হোটেলে ফেরা যাক।" এই বলে তিনি ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি আমরা। এরপর হঠাৎই আমাদের চমক দিয়ে একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সেই বাচ্চাটা! প্রফেসর তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন, "আমাদের কাছে জিনিসটা রেখে কোথায় গেছিলে তুমি? আমরা তোমাকে কত খুঁজেছি জান?"

ছেলেটা তার কথা শুনে শুধু পেসোগুলো তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ওটা আমাকে ফেরত দাও।"

BanglaBook.org

জুয়ান মোড়কটা কোটের ভিতর থেকে বার করলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা ছেলেটার হাতে না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটা তুমি কোথায় পেলে? তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

"ওটা তেজকাৎলিপোকা মন্দিরের জিনিস। বাচ্চাটা ভুল করে ওটা দিয়ে গেছিল। ফেরত দেবার জন্য ধন্যবাদ। ও আমার সঙ্গেই এসেছে।" জুয়ানের প্রশ্নের উত্তরে কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল আর একটা থামের আড়াল থেকে।

তাকিয়ে দেখি আধো অন্ধকারের মধ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা মূর্তি। লোকটার পরনে স্থানীয় পোশাক। ঘাসের টুপিটা এমনভাবে মুখের ওপর নামানো যে তার মুখটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। লোকটা কিন্তু কথাগুলো স্প্যানিশে বলল না, বলল স্পষ্ট ইংরেজিতে। তার বাচনভঙ্গিতে মনে হল সে ইউরোপীয়। সম্ভবত বার্ধক্যের সীমানায় উপনীত সে। তবে তার পরনে এ পোশাক কেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি এবার তার উদ্দেশে বললাম, "এত দামি জিনিস বাচ্চাটার হাতে দিয়েছেন কেন? যদি ওটা ফেরত না পেতেন?"

সে জবাব দিল, "ভুল হয়েছে। আমরাও খুঁজছিলাম আপনাদের। জিনিসটা যে কী তা যে আপনারা দেখেছেন তা বুঝতে পারছি। অন্য কেউ হলে তো জিনিসটা ফেরত দিতে আসত না। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। ওটা এবার ওর হাতে দিন। অনেকটা পথ ফিরতে হবে আমাদের।" এরপর এ প্রসঙ্গে আর কথা বলা যায় না। জুয়ান বাচ্চাটার হাতে মোড়কটা তুলে দিতেই বাচ্চাটা পেসোগুলো ফেরত দিয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জুয়ান এবার সেই লোকটাকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ইউরোপীয়। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?" অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, "কিছু মনে করবেন না, যার সঙ্গে একটু আগে আপনারা কথা বলছিলেন সে কি আপনাদের পূর্বপরিচিত? ওর হাতটা আপনারা লক্ষ করেছেন?"

লোকটার কথার মানে বুঝতে না পেরে আমরা তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। লোকটা মনে হয় কী একটা কথা আমাদের উদ্দেশে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা তাকে যেন কী বলল। আমাদের উদ্দেশে অস্পষ্ট স্বরে একবার যেন বলল, "ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।" আর তারপরই চোখের পলক ফেলার আগেই তারা দুজন যেন অদৃশ্য হয়ে গেল সার সার স্তম্ভের আলো আঁধারিতে।

জুয়ান মন্তব্য করলেন, "বড় অদ্ভুত তো লোকটা!" আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম চত্বরের ওপাশ থেকে আমাদের দিকে আবার ফিরে আসছেন মিস্টার কমোলোৎল।

আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। কমোলোৎল মনে হয় দূর থেকে দেখতে পাননি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চা আর সেই লোকটাকে। ফিরে এসে তিনি বললেন, "আমার আইকার্ডটা রয়ে গেছে। ওটা নিতে এলাম।"

BanglaBook.org

জুয়ানের হাতে সত্যি তখনও সেটা ধরা। তাঁকে ফেরত দিতে খেয়াল ছিল না। প্রফেসর তার দিকে কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনাকে আর কষ্ট করে রাতে হোটেলে যেতে হবে না। ভাবছি আমরা আপনার সঙ্গে যাব কাল। তা আমাদের কী শেয়ার করতে হবে বলুন তো?" জুয়ানের কথার পরিপ্রেক্ষিতে ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমাদের নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তাঁর সঙ্গে কীভাবে যাব সে কথা বলতে লাগলেন।

৪

পরদিন সকাল আটটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম আমরা। একটা কার্গো ভ্যান জাতীয় গাড়ির সামনে জনা চারেক সঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস্টার কমোলোৎল। আমরা তাদের কাছে পৌঁছতেই তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "নিন, উঠে পড়ুন। বিকালের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব সেখানে।" এই বলে তিনি আর একজন সঙ্গীকে ইশারা করতেই সে আমাদের মালপত্র নিয়ে তুলে দিল গাড়ির পিছনে। কমোলোৎল-র সঙ্গীদের গঠন বেশ বলিষ্ঠ, সকলেই মেক্সিকান। তবে একটা জিনিস আমাদের নজর এড়াল না যে তাদের প্রত্যেকেরই অঙ্গহানি হয়েছে। দুজনেরই বাঁ হাত নেই। একজনের একটা অক্ষিকোটর শূন্য, আর একজনের কান নেই। তা যেন নিখুঁতভাবে কেটে নামানো হয়েছে। এ ব্যাপারগুলো আমাদের চোখে পড়েছে দেখে বুঝতে পেরেই মনে হয় কমোলোৎল আমাদের উদ্দেশে বললেন, "আমার সঙ্গীরাও সবাই আমার মতো প্রতিবন্ধী। আমার সোসাইটির সদস্য।"

গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। গাড়ির ভিতরটা দুটো ভাগে লোহার জাল দিয়ে বিভক্ত। লম্বা ধরনের গাড়িটার পিছনের অংশে কোনো জানলা নেই। ওখানে সম্ভবত মালপত্র রাখা হয়। আমাদের সঙ্গে সকলেই উঠে পড়ল জালের এক পাশে ড্রাইভারের আসন সংলগ্ন জায়গাতে। কমোলোৎল-র কানহীন সঙ্গী ড্রাইভারের আসনে বসে গাড়ি স্টার্ট করতেই আমাদের আসনের ঠিক পিছনে জালের ওপাশ থেকে এক দুর্বোধ্য চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম সবাই। তাকিয়ে দেখি জাল ধরে ঝাঁকাচ্ছেন এক মহিলা। পরনে ছিন্ন পোশাক। জাল ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিস্ফারিত চোখে তিনি যেন কী বলতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো শব্দ ছাড়া অন্য কিছু শব্দ বেরোচ্ছে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি দেখতে পেলাম তাঁর মুখগহ্বরে কোনো জিভ নেই। মেক্সিকোর রোদ প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার চামড়ার রংকে কিছুটা পুড়িয়ে দিয়েছে, তথাপি তিনি যে ইউরোপীয় তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আমার মতো বিস্মিত জুয়ান কমোলোৎলকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে উনি?"

মিস্টার কমোলোৎল আফশোসের সুরে বললেন, "ভদ্রমহিলা একদা ছিলেন এক বৃটিশ

BanglaBook.org

প্রত্নবিদ্। বহু বছর আগে তেজকাৎলিপোকা গেছিলেন। হয়তো আশা ছিল সেখানে ধনরত্ন খুঁজে পাবেন। কিন্তু অভিযানের ব্যর্থতা ওঁকে পাগল করে দেয়। ওখানেই উনি পথে পথে ঘুরে বেড়ান। কেউ ওঁকে ওঁর দেশ থেকে খুঁজতে আসেনি। ক্যান্সারের কারণে ওঁর জিভ বাদ গেছে, মাথাও খারাপ, এই অসহায় মহিলাকে আমরা মাঝে মাঝে সাহায্য করি। ওঁকে এখানে আনা হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। তেজকাৎলিপোকাতে ফেরত দিতে যাচ্ছি।"

তার কথা শুনে প্রফেসর বললেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আপনারা যে এসব মানুষের জন্য কাজ করেন, এটা খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার।"

কমোলোৎল বিনয়ীভাবে বললেন, "তেমন কিছু আমরা করে উঠতে পারি না অর্থাভাবের জন্য। তবে চেষ্টা করি।"

গাড়ি চলতে শুরু করল। সেই ভদ্রমহিলাও একসময় চিৎকার থামিয়ে চুপচাপ হয়ে গেলেন। শহর থেকে বেরিয়ে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের পথ ধরল আমাদের গাড়ি। পথের চারপাশে কোনো জনবসতি নেই। মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ছে ক্যাকটাসের ঝোপ। সবুজ বলতে শুধু ওইটুকুই। আমাদের গাড়িটা বেশ পুরোনো, লড়ঝড় করতে করতে চলছে। কোনো কোনো সময় হয়তো দূরে দেখা যাচ্ছে অ্যাজটেক পিরামিডের চুড়ো। অতীতের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গভাবে তারা দাঁড়িয়ে জনহীন মরুস্থলীর বুকে। প্রফেসর জুয়ান কমোলোৎলকে বললেন, "আমরা যে জায়গাতে যাচ্ছি সে জায়গা সম্বন্ধে কিছু বলবেন?"

কমোলোৎল বললেন, "১০০০ খ্রিস্টাব্দে অ্যাজটেকরা মেক্সিকোর স্বভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকো উপত্যকায় পৌঁছে বসতি স্থাপন করে ও ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তেনোকতিতলান নগরী স্থাপন করে সেখানে প্রথম মন্দির নির্মাণ করে। ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অ্যাজটেক রাজা আকামপিকৎলি সিংহাসনে বসেন। ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে এই ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। আমরা যে নগরীতে যাচ্ছি সে নগরী নির্মিত হয় সম্রাট হুইৎজিলিহুইৎল-এর আমলে। তিনি ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার সময়তেই গড়ে ওঠে এই প্রাচীন মন্দির নগরী। বহু পিরামিড মন্দির আছে সেখানে। তেজকাৎলিপোকার মন্দির ছাড়াও ওখানে সূর্যদেব হুইৎজিলোপোকৎলি, পালকভূষিত সর্পদেব কোয়েৎজালকোয়াৎল, মৃত যোদ্ধাদের দেবতা তেওইয়াত্তমিকি-র মন্দির আছে। তবে তেজকাৎলিপোকার পিরামিডই তার মধ্যে টিকে আছে। তেজকাৎলিপোকা কীসের দেবতা জানে আপনি?"

"তিনি হলেন রাত্রি ও মায়াজালের দেবতা।" জবাব দিলেন প্রফেসর।

উত্তর শুনে প্রশংসাসূচক শব্দ করে কমোলোৎল বললেন, "ঠিক বলেছেন। ওই পিরামিড মন্দিরে অ্যাজটেক সম্রাট ও পুরোহিতরা জাদুবিদ্যা চর্চা করতেন। ওই মন্দিরে এক অদ্ভুত বিগ্রহ আছে। প্রাচীন অ্যাজটেক ক্যালেন্ডারের শেষ দিনে প্রতি বছরে এক দিন

BanglaBook.org

খোলা হয় ওই পিরামিড মন্দিরের দরজা। সারারাত ধরে উৎসব হয়। যাদের দেহে এখনও খাঁটি অ্যাজটেক রক্ত প্রবাহমান, যারা এখনও খাঁটি অ্যাজটেক ধর্ম ঐতিহ্যকে, তারা প্রত্যেকে ওই রাতে উপাসনার জন্য উপস্থিত হয় সেখানে। আধুনিক সভ্যতার ঘৃণ্য বসন পরিত্যাগ করে অ্যাজটেক সাজে সজ্জিত হয়ে অন্তত একটা রাতের জন্য তারা ফিরে যায় সুদূর অতীতে, হয়ে ওঠে খাঁটি অ্যাজটেক। কালই সেই রাত। দেখবেন কেমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় আপনাদের।"

জুয়ান শুনে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কিন্তু কোনো বইতে এ মন্দিরের কথা তেমনভাবে দেখিনি তো?"

মিস্টার কমোলোৎল মৃদু হেসে বললেন, "সব কথা কি আর বইতে লেখা থাকে? তাছাড়া বাইরের কোনো লোককে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। খবরের কাগজ বা ওই জাতীয় লোককে তো কোনোভাবেই নয়। আপনারা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন বলে ওই দুর্লভ অভিজ্ঞতার সঙ্গী হতে পারবেন।'

আমি জানতে চাইলাম, "আমরা কি ওই প্রাচীন বিগ্রহ দর্শন করতে পারব?"

তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, পারবেন।" এরপর মৃদু হেসে তিনি বললেন, "এই যে এত প্রাচীন স্থাপত্য আপনারা এখানে দেখেন এসবই আসলে ওই দেবতারই দান।"

সময় এগোতে থাকল, আমরাও নানা রকম কথাবার্তা, গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। তার অধিকাংশই ইতিহাসকেন্দ্রিক গল্প। কমোলোৎল-র সঙ্গীরা কিন্তু একদম নিশ্চুপ। তারা নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলছে না। সেই ভদ্রমহিলারও কোনো সাড়া নেই। দুপুরের দিকে বাইরে থেকে ভেসে আসা গরম বাতাসে যেন ঝলসে যেতে লাগলাম সবাই, ধীরে ধীরে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল আমাদের, বাইরের দিকে জুয়ান বা আমি কেউই আর তাকাতে পারছি না। কিন্তু কমোলোৎল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রৌদ্রদগ্ধ, রুক্ষ মরুপথের দিকে, যে পথ আমাদের নিয়ে চলেছে সেই প্রাচীন নগরীতে। বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিক্রম করার পর অবশেষে একসময় আমাদের কষ্ট শেষ হল, বিকালের দিকে মিস্টার কমোলোৎল বললেন, "ওই দেখুন, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। আর মাত্র ঘণ্টা খানেকের পথ।"

তাকিয়ে দেখলাম অনেক দূরে দিকচক্রবালে অস্পষ্টভাবে যেন ফুটে আছে এক পিরামিডের মাথা। ক্রমশই তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আমাদের চোখে। বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা এক প্রাচীন তোরণ অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম এক খণ্ডহর নগরীতে।

৫

সকালবেলা আমি আর জুয়ান দাঁড়িয়ে ছিলাম তেজকাৎলিপোকার পিরামিড থেকে কিছুটা দূরে বিশাল এক স্তম্ভের গায়ে খোদিত ক্যালেন্ডারের সামনে। গতকাল আমরা

BanglaBook.org

এখানে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে ছিল বলে নগরী দেখতে আর বেরোনো হয়নি আমাদের, তাই আজ সাতসকালেই বেরিয়েছি। এখানে কোথায় কী দেখার আছে তা মোটামুটি আমাদের বলে দিয়েছেন কমোলোৎল। তবে তেজকাৎলিপোকার মন্দিরে কমোলোৎল-র সঙ্গে রাতে ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না। আমি আর প্রফেসর জুয়ান গতকাল রাত কাটিয়েছি একটা ছোট পিরামিড সংলগ্ন প্রাচীন পাথুরে কক্ষে। মিস্টার কমোলোৎল সেই জায়গায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা অন্যত্র কোথাও ছিলেন।

এ প্রাচীন নগরী সত্যি বড় অদ্ভুত। আধুনিক সভ্যতার কোনো চিহ্ন এখানে এসে আমাদের চোখে পড়েনি। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই শুধু প্রাচীন পিরামিড মন্দির, স্তম্ভ, মিনার আর প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। আর তার গায়ে খোদিত আছে অ্যাজটেক শিল্পকলার অদ্ভুত সব নিদর্শন। শত শত বছরের রোদ বৃষ্টি-ঝড়কে উপেক্ষা করে আজও তারা টিকে আছে। এখানকার মানুষজনের পোশাকও প্রাচীন অ্যাজটেকদের প্রথা অনুযায়ী। মাথায় তাদের দীর্ঘ পালকের রংবেরঙের সাজ, পালক বা চামড়ার পোশাক-পাদুকা, কানে, গলায় বাহুতে রঙিন পাথরের গহনা, পুরুষদের কারোকারো আবার নাক ফুটো করে তাতে নলাকৃতি কাঠের টুকরো গোঁজা, মুখে, বাহুতে অদ্ভুত সব উল্কি। নগরীর স্থাপত্য, পরিবেশ, লোকজনের পোশাক এসব মিলিয়ে সময় যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কাল এখানে আসার পরই লক্ষ করেছি এই প্রাচীন অ্যাজটেক গোষ্ঠী বেশ সম্মান করে কমোলোৎলকে। কাল আমরা এখানে আসার পর একদল মানুষ জমা হয়েছিল আমাদের ঘিরে। তারা প্রত্যেকেই মাথা ঝোঁকাচ্ছিল কমোলোৎল-র প্রতি। আর আমাদের অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল। সম্ভবত সভ্য জগতের আধুনিক মানুষ সচরাচর এখানে আসে না। তেমন কোনো লোক আমাদের চোখে পড়েনি। ট্যুরিস্ট তো নয়ই।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। সকালের সূর্যের আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে অ্যাজটেক যোদ্ধার আদলে খোচিত পাথুরে স্তম্ভগুলোর গায়ে আর বিশালাকৃতি ক্যালেন্ডারের ওপর। দু-মিটার ব্যাসের গোলাকৃতি ক্যালেন্ডারের গায়ে নানা ধরনের অলংকার আর চিহ্ন খোদিত আছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার পাঠোদ্ধার করা কঠিন। প্রফেসর জুয়ান উৎসাহ নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে সেটা খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, "সম্ভবত এ ক্যালেন্ডার পৃথিবীর প্রাচীনতম ক্যালেন্ডারের একটি। যদিও আমার পক্ষে এর সব কিছু বলা সম্ভব নয় তবু এ ব্যাপারে তোমাকে একটা ধারণা দিই। অ্যাজটেকদের ৩৬০ দিনের বছরের নাম ছিল ভোনালপোহুয়াল্লি। ২০ দিনে ছিল মাস, ১৮ মাসে ছিল বছর। প্রথম মাস হল অ্যালকাকুয়ালতো, ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই মার্চ। আর শেষ মাস হল ইজকাল্লি, ২০ শে জানুয়ারি থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ৩৬৫

BanglaBook.org

দিনে যে সৌর বৎসর তাদের তা জানা ছিল। তাই সৌর বৎসরের হিসাব ঠিক রাখার জন্য বছরের শেষ পাঁচটা দিনকে তারা বলত শূন্য দিবস বা মোনতেমি। প্রত্যেক মাসেই অ্যাজটেকরা ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করত। কিন্তু 'শূন্য দিবস' অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ছিল ১৮টি ধর্মমাসের বাইরে। ওই পাঁচ দিন ধর্মাচার নিষিদ্ধ ছিল। ওই ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন ধর্মমাস অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া আছে।"

আমি তার কথা শুনে বললাম, "আজই তো ৮ই ফেব্রুয়ারি, এ ক্যালেন্ডারের শেষ দিন!"

প্রফেসর বললেন, "হ্যাঁ, তাই। কাল গাড়িতে এখানে আসার সময় কমোলোৎল এ কথাটা বলেছিলেন। উৎসবটা বছরের শেষ দিনই হয়।"

"উনি আপনাদের আর কিছু বলেননি?" জুয়ানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমাদের খুব কাছ থেকেই। আর তারপরই কাছেই একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে যারা বেরিয়ে এল তাদের দেখে চমকেই উঠলাম দুজনেই। তিওতিহুকান চত্বরের সেই বাচ্চা ছেলেটা আর সেই বৃদ্ধ। সেদিনের মতো ঘাসের টুপিটা আজও ঢেকে রেখেছে বৃদ্ধর মুখ। তাদের যে এভাবে হঠাৎ আবার এখানে এসে দেখতে পাব তা ধারণা ছিল না আমাদের। আমাদের মন থেকে তারা প্রায় মুছেই গেছিল। অবাক হয়ে আমরা তাকিয়ে রইলাম তাদের দিকে। প্রশ্নটা যে বৃদ্ধই করেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না আমাদের।

প্রফেসর জুয়ান বৃদ্ধের উদ্দেশে বললেন, "আপনারা এখানে কোথায় থাকেন?" বৃদ্ধ সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, "আপনারা তো আজ রাতে তেজকাৎলিপোকা পিরামিড মন্দিরে যাচ্ছেন? এই কালো কাপড়ের ফেটিটা সঙ্গে নেবেন।" এই বলে তিনি পোশাকের ভিতর থেকে দুটো কালো কাপড়ের টুকরো বের করে নামিয়ে রাখলেন পাথরের ওপর।

জুয়ান তার কথা শুনে বললেন, "আপনি কে? আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না! কী বলতে চাইছেন আপনি?"

তিনি জবাব দিলেন, "ওসব বলার সময় এখন নেই। ইজকাল্লির শেষ দিন আজ। আপনাদের পক্ষে দিনটা শুভ নয়। আগাম বিপদ এড়াতে মন্দিরে যাওয়া পর্যন্ত কমোলোৎলো-র কথা মেনে চলবেন। আর এই সাক্ষাতের ঘটনা ওর কাছে গোপন রাখবেন। যথাসময়ে আবার দেখা হবে।" এই বলে আমাদের আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন অন্য দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর জুয়ান বললেন, "কী বলে গেল লোকটা? ওর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে কোনো বিপদ আসছে আমাদের। কিন্তু কী বিপদ? নাকি, লোকটা পাগল বা আমাদের বিদেশী দেখে মজা করার জন্য ভয় দেখিয়ে

BanglaBook.org

গেল, কে ওরা?" আমি বললাম, "ব্যাপারটা আমারও মাথায় ঢুকছে না। কালো কাপড়ই বা ওরা রেখে গেল কেন? তবে যাই হোক আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।" এই বলে আমি গিয়ে কালো কাপড় দুটো কুড়িয়ে নিলাম। হাতে নেবার পর বুঝতে পারলাম দুটো কাপড়ের মধ্যেই পাতলা কাঠ জাতীয় কোনো কিছুর আস্তরণ আছে। জিনিসগুলো অনেকটা প্যাডের মতো। জুয়ান বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেগুলো দেখার পরও সেগুলো কী কাজে লাগতে পারে বুঝতে পারলেন না। সেগুলো পকেটে রেখে তিনি বললেন, "চলো, এবার অন্য দিকে যাওয়া যাক। আর যতক্ষণ না এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ এটা মিস্টার কমোলোৎল-র থেকে গোপন রাখাই প্রয়োজন। তবে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।"

আমরা এরপর আবার ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম আশেপাশের ছোট ছোট পিরামিডগুলোতে। তবে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না বৃদ্ধর কথাগুলো। প্রফেসর জুয়ানের মুখও চিন্তাক্লিষ্ট মনে হল। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একসময় তিনি তো বলেই ফেললেন, "ওই লোকটাকে দিনের আলোতে দেখে আর ওর কথা শুনে আমার ওকে ইওরোপীয়ান বলেই মনে হল! এই পাণ্ডববর্জিত, অর্ধসভ্য মানুষদের প্রাচীন নগরীতে ও কি করছে?" জুয়ানের কথা শুনে বুঝতে পারলাম আমার মতো ওঁর মাথাতেও একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

৬

সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে রোদও চড়তে লাগল। এ পিরামিড থেকে ও পিরামিড ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে দু-একজন স্থানীয় মানুষ চোখে পড়ছে আমাদের। দূর থেকে তারা অদ্ভুত চোখে আমাদের দেখছে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একসময় আমরা এসে উপস্থিত হলাম তেজকাৎলিপোকা পিরামিডের কাছে। প্রায় চারশো ফুট উঁচু পিরামিডটা বিশাল এক চত্বরের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পিরামিড সংলগ্ন চত্বরটা নিচু কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু কর্মব্যস্ত লোকজন চোখে পড়ছে। কাঠের বালতিতে জল নিয়ে কেউ পিরামিডের ওপরে ওঠার সিঁড়ি ধুচ্ছে, কেউ বা চত্বর পরিষ্কার করছে ঝাঁট দিয়ে। তবে কোনো শোরগোল নেই, যেন যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে ওরা। রাত নামলেই তো উৎসব।

ঘেরা জায়গার বাইরে দাঁড়িয়ে বিশাল পিরামিডের দিকে তাকিয়ে আমি প্রফেসরকে বললাম, "অ্যাজটেকদের সব মন্দিরেই কি বলি দেওয়া হত?" জুয়ান বললেন, "হ্যাঁ, প্রায় সব মন্দিরেই। আর তেজকাৎলিপোকা মন্দিরে তো অবশ্যই। তেজকাৎলিপোকা শব্দের অর্থই হল, 'যে দেবতা কেবলমাত্র বলির রক্ত ভক্ষণ করেন।' আমাদের সামনে যে

BanglaBook.org

পিরামিড দাঁড়িয়ে আছে তার সোপানশ্রেণি কত মানুষের রক্তে সিক্ত কে জানে? আসলে এ পিরামিড মন্দিরগুলো ছিল মশান। এত মানুষকে একসঙ্গে বলি দেওয়া হত যে অত উঁচু পিরামিডের গা বেয়ে রক্ত চুঁইয়ে ভূমি স্পর্শ করত।"

কথা বলছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখি একজন মেসো-আমেরিকান পিরামিড চত্বর ছেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি কাছে আসার পর বুঝতে পারলাম তিনি আর কেউ নন, মিস্টার কমোলোৎল! ইওরোপীয় পোশাক ছেড়ে পুরোদস্তুর পালকের পোশাকে সজ্জিত তিনি। অদ্ভুত লাগছে তাঁকে দেখতে। ঠিক যেন ছবির বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা কোনো অ্যাজটেক। তাঁর কোমরে একটা ছুরিও ঝুলছে। তিনি আমাদের উদ্দেশে বললেন, "কী, বেড়ানো কেমন হচ্ছে? রাতের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বলে আপনাদের সঙ্গ দেওয়া যাচ্ছে না, ক্ষমা করবেন।" প্রফেসর বললেন, "না না ঠিক আছে। ভালোই ঘুরছি আমরা। তা আপনার পরনে এ পোশাক কেন? রাতে কখন শুরু হবে অনুষ্ঠান?"

কমোলোৎল হেসে জবাব দিলেন, "আমিও তো খাঁটি অ্যাজটেক, তাই এই পোশাক। ঠিক মাঝরাতে আমি আপনাদের নিতে যাব। এ কথাটাই আপনাদের বলতে এলাম। আজ রাতের অনুষ্ঠানের অতিথি আপনারা।"

এরপর তিনি আর কথা বাড়ালেন না, আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে আবার চত্বরের দিকে ফিরতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল। ভদ্রলোকের ডান হাতের উন্মুক্ত বাহুতে বিরাট একটা সাপের উল্কি আঁকা আছে। ঠিক ওরকমই সাপের ছবি খোদিত ছিল সেই ফ্লিন্ট পাথরের ছুরিতে। এর পরমুহূর্তেই আমার মনে পড়ল তিওতিহুকান পিরামিড চত্বরে সন্ধ্যাবেলা ছুরিটা ফেরত নিতে এসে মিস্টার কমোলোৎল সম্পর্কে বৃদ্ধের শেষ প্রশ্ন, "ওর হাতটা আপনারা লক্ষ করেছেন?"

কমোলোৎল চলে যাবার পর আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম অন্য দিকে। যেতে যেতে আমি প্রফেসরকে বললাম, "প্রাচীন অ্যাজটেকরা কি বাহুতে সর্প চিহ্ন আঁকত? কোমোলোৎল-র হাতে ওই দু-মুখওয়ালা সাপের উল্কি দেখলাম। আপনি খেয়াল করেছেন?"

চলতে চলতে প্রফেসর হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন আমার কথা শুনে। তারপর বললেন, "না, খেয়াল করিনি, আশ্চর্য! ও উল্কি কারা আঁকত জান? অ্যাজটেক পুরোহিতরা। সৃষ্টি আর ধ্বংসের প্রতীক দু-মুখওয়ালা সর্প আঁকা থাকত প্রত্যেক পুরোহিতে বাহুতে, যে বাহু নরবলির হৃৎপিণ্ড নিয়ে নিবেদন করত দেবতার উদ্দেশে!"

প্রফেসরের কথা শুনে নিজেরই অজান্তেই যেন চমকে উঠলাম আমি। বৃদ্ধ তাহলে কী বলতে চেয়েছিলেন?

জুয়ানও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন এরপর। গভীরভাবে কী যেন ভাবতে ভাবতে

BanglaBook.org

হাঁটতে লাগলেন। আমরা আর এরপর কোথাও গেলাম না, সোজা আমাদের আস্তানার পথ ধরলাম।

৭

পাথুরে ঘরে ফিরে আসার পর সারাটা দিন আমরা ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। কমোলোৎল-র দেখা সারাদিনের মধ্যে আর পেলাম না আমরা। নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলেও কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। বাইরে সন্ধ্যা নামার পর যেন সেটা আরও বাড়তে লাগল। আমার যেন মনে হতে লাগল বাইরে আমাদের অজান্তে যেন কীসের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে! কিন্তু আমার মনে কেন অস্বস্তি হচ্ছে তার সঠিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। প্রফেসর জুয়ানকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মনে হলেও তার ভেতরেও যে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে তা বুঝতে পারলাম। রাত আটটা নাগাদ খাবার খেয়ে নিয়ে মিস্টার কমোলোৎল-র প্রতীক্ষা করতে লাগলাম আমরা। সময় কাটাবার জন্য প্রফেসর অ্যাজটেক সভ্যতার নানা ইতিহাস আমাকে বলতে লাগলেন।

তখন প্রায় মাঝরাতই হবে। মিস্টার কমোলোৎল এসে হাজির হলেন আমাদের ঘরে। তাঁর সঙ্গে মশালধারী তিনজন লোক। লোকগুলো আর কমোলোৎল-র পরনে পুরোদস্তুর অ্যাজটেক সাজ। কমোলোৎল-র দেহ সাদা পালকের পোশাকে আবৃত। মাথায় বিশাল পালকের সাজ, গলায় রংবেরঙের পাথরের মালা। কোমরবন্ধ আর ডানহাতের বাজুবন্ধ মশালের আলোতে ঝকমক করছে। সেগুলো যে খাঁটি সোনার তা বুঝতে অসুবিধা হল না। মশালের আলোতে তার হাতে আঁকা উল্কিটাও আমার নজর এড়াল না। দ্বিমুখী সর্প! আমাদের বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কমোলোৎল হেসে বললেন, "কী দেখছেন? আজকের দিনে আমাকে এ পোশাকই পরতে হয়।"

এরপর তিনি বললেন, "সারাদিন কাজের চাপে আর আসতে পারিনি। নিন এবার চলুন। অনুষ্ঠান ওদিকে শুরু হতে চলেছে। আপনারা তো অতিথি। তাই আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে সবাই। এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে চলেছেন আপনারা।"

প্রফেসর জুয়ান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শেন, চলো তাহলে যাওয়া যাক।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে কমোলোৎল আর তার সঙ্গীদের সঙ্গে পিরামিড চত্বরের দিকে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। দূর থেকেই দেখতে পেলাম অসংখ্য মশালের আলো জ্বলছে চত্বরে। আমরা সেখানে পৌঁছতেই দেখলাম অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়েছে সেখানে। অন্তত পাঁচশ মানুষ হবে। লাল মানুষ সব। অদ্ভুত তাদের সাজপোশাক। ঢেউ খেলানো সুরে উচ্চগ্রামে তারা কী যেন গাইছে! দুর্বোধ্য তাদের ভাষা! এত লোক সমাগম দেখে জুয়ান জানতে চাইলেন, "এত লোক কি এখানেই থাকে?"

BanglaBook.org

কমোলোৎল বললেন, "স্থানীয় মানুষ কিছু আছে ঠিকই। কিন্তু অধিকাংশই দূর দূর থেকে সমবেত হয়েছে এই উৎসব উপলক্ষ্যে। তাদের প্রত্যেকের ধমনীতেই খাঁটি অ্যাজটেক রক্ত বহমান। ঠিক যেমন আমার ধমনীতেও।" এই বলে একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসলেন তিনি।

আমরা মন্দির চত্বরে উপস্থিত হতেই কোলাহল থেমে গেল। গান থামিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দু-সারে ভাগ হয়ে পিরামিডের দিকে যাবার জন্য পথ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। পিরামিডের মাথায় বেশ বড় একটা চাঁদ উঠেছে। তার আলো পিরামিডের ওপর পড়ে কেমন যেন একটা অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পিরামিডের সোপানশ্রেণির স্থানে স্থানে কয়েকটা মশাল গোঁজা থাকলেও একদম মাথায় কোনো আলো চোখে পড়ল না নিচ থেকে। সারিবদ্ধ জনতার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে।

আমরা এসে দাঁড়ালাম পিরামিডের নীচে। আমাদের সামনে পিরামিডের গা বেয়ে চওড়া সোপানশ্রেণি উঠে গেছে ওপর দিকে। তিনটে থাক আছে পিরামিডের গায়ে। প্রত্যেক থাকে একটা রেলিং ঘেরা বারান্দা।

সিঁড়িতে ওঠার আগে কমোলোৎল কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেটা আমাদের একান্ত পবিত্র স্থান। ওখানে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় যা আপনাদের জানা নেই। আশা করি পবিত্র মন্দিরে পৌঁছে আমার অনুরোধ আপনারা মেনে চলবেন। বিশ্বাসের অমর্যাদা করবেন না।"

তাঁর কথা শুনে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন প্রফেসর। কমোলোৎল এরপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন, আর তার পিছন পিছন আমরা।

ক্রমশই আমরা ওপরে উঠে চলেছি। একসময় পিরামিডের প্রথম দুটো ধাপের বারান্দা অতিক্রম করে গেলাম আমরা। আমি একবার নীচের দিকে তাকালাম। সমবেত জনতা যেন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। এরপর পিরামিডের ওপর থেকে একটা শব্দ যেন কানে আসতে লাগল। ওপরে যত উঠতে লাগলাম শব্দটা তত বাড়তে লাগল। একঘেয়ে সুরে সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। সেই শব্দ শুনতে শুনতে কমোলোৎল-র পিছন পিছন আমরা অবশেষে পৌঁছে গেলাম পিরামিডের মাথায়। চাঁদের আলোতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তেজকাৎলিপোকার মন্দির! থাম পরিবেষ্টিত কালো পাথরের তৈরি মন্দিরের বিশাল দরজাটা বন্ধ। আর সেই দরজার সামনে আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে একদল আবছা মূর্তি মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে, আর মাঝে মাঝে নাচের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। আমরা সেখানে পৌঁছবার পর আমাদের একটা থামের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে কমোলোৎল এগিয়ে গেলেন সেই সব ছায়ামূর্তির দিকে। তাদের মন্ত্রোচ্চারণ এবার থেমে গেল। তবে কমোলোৎলকে ঘিরে ধরে তারা কয়েক মুহূর্ত বাদেই আবার অদ্ভুত ছন্দে নাচতে লাগল, আর এবার গম্ভীর স্বরে

BanglaBook.org

মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন কমোলোৎল। যারা নাচছে তাদের একজনের হাতে একটা ধুনুচি মতো আছে। নাচের তালে একটা ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে চারপাশের পরিবেশকে আরও যেন ভৌতিক করে তুলেছে। তবে সেই ধোঁয়ার মধ্যে কেমন যেন এক মাদকতাময় গন্ধ আছে যা ক্রমশ অবশ করে দিচ্ছে আমাদের দেহ-মনকে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সম্মোহিত হয়ে যেন দেখতে লাগলাম সেই নৃত্য।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলার পর একসময় থেমে গেল সেই নৃত্য। কমোলোৎল আর অন্যরা পিরামিডের কিনারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে সমবেতভাবে কী যেন বলে উঠল। সেই শব্দ মনে হয় কানে গেল নীচে উপস্থিত জনতার। সমবেত স্বরে তারা হর্ষধ্বনি করে উঠল। এরপর কমোলোৎল-র এক সঙ্গী একটা পাত্র হাতে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সেই পাত্র থেকে একটা তরল পদার্থ নিয়ে তার টিকা পড়িয়ে দিল আমাদের ললাটে। পাত্রটা যখন আমার সামনে লোকটা আনল তখন একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ অনুভব করলাম আমি। সম্ভবত রক্তটিকা পরানো হল আমাদের। এ কাজ সম্পন্ন করে লোকগুলো মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মন্দিরের দরজার পাল্লাটা টেনে একটু ফাঁক করল। একটা শব্দ উঠল তাতে। তা শুনে মনে হল অনেকদিন পর সেটা আবার খোলা হল। পাল্লা খোলার পর লোকগুলো আর কিন্তু সেখানে দাঁড়াল না। কমোলোৎল আর আমাদের দুজনকে ওপরে রেখে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

৮

পিরামিডের ওপর মন্দিরের বিশাল দরজার সামনে আমাদের একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন কমোলোৎল। চাঁদের আলোতে কেমন যেন অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটের কোণে। তিনি আমাদের উদ্দেশে বললেন, "কী, এ জায়গাতে এসে আপনাদের ভয় করছে নাকি?"

জুয়ান তাঁর গলার স্বর যতটা সম্ভব শান্ত রেখে বললেন, "না, ভয় করবে কেন? যদিও এখানকার পরিবেশটা একটু অদ্ভুত একথা মানতেই হয়।" কমোলোৎল-র মুখে এরপর বাঁকা হাসিটা আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রফেসরের উদ্দেশে তিনি যেন বিদ্রুপের সুরে বললেন, "আপনি তো স্পেনিয়ার্ড। বহু শতাব্দী আগে আপনার পূর্বপুরুষরাই ধ্বংস করে ছিল আমাদের সুমহান সভ্যতাকে। না, তার সব কিছু ধ্বংস করতে পারেনি কর্তেজরা। এখনও তার অনেক কিছু টিকে আছে। অ্যাজটেক জনগোষ্ঠীকে তারা বর্বর ভাবত, কিন্তু তাদের চেয়ে আসলে হাজার গুণে এগিয়ে ছিলাম আমরা। আমাদের সভ্যতার গূঢ় রহস্য অনুধাবন করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। আপনারা যে মূর্তি দেখতে যাচ্ছেন তার সামনে কর্তেজ এসে দাঁড়ালে ইতিহাসটাই ঘুরে যেত। এ মূর্তির সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।'

BanglaBook.org

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, "যান, এবার আপনারা তেজকাৎলিপোকার বিগ্রহ দর্শন করে আসুন। ভিতরে ঢুকে পরপর তিনটে ঘর পার হবেন আপনারা। চতুর্থ ঘরেই আছে সেই বিগ্রহ। সেই ঘরের ভিতর লাল আভা দেখতে পাবেন। গর্ভগৃহ চিনতে অসুবিধা হবে না।" এই বলে তিনি দরজাটা দেখিয়ে দিলেন।

আমি তার উদ্দেশে বললাম, "আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?"

তিনি জবাব দিলেন, "অনুষ্ঠানের কাজ সবে শুরু হয়েছে, তা শেষ না হলে আমাদের কারও দেবদর্শন নিষেধ। আপনারা দেখে আসুন।" তাঁর কথা শোনার পর একটু ইতস্তত করে আমরা এগোলাম মন্দিরের দরজার দিকে।

মন্দিরের ভিতরটা অন্ধকার। অনেকদিন দরজা বন্ধ থাকায় বাতাসটা বেশ ভারী। প্রথম ঘরটা বেশ লম্বা। পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেলাম ঘরের দেওয়ালে খোদিত আছে ভয়ংকর সব মূর্তি। যুগ যুগ ধরে তারা পাহারা দিচ্ছে দেবতা তেজকাৎলিপোকাকে। দ্বিতীয় ঘরটাতে পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এখানে, বাইরের আলো এ ঘরে আসছে না। কোনোরকমে হাতড়ে হাতড়ে সে ঘর অতিক্রম করে তৃতীয় ঘরে পৌঁছতেই ঘরের এক পাশে শেষ ঘরে যাবার পথটা দেখতে পেলাম আমরা। গর্ভগৃহের খোলা দরজা দিয়ে একটা লাল আভা বাইরে এসে পড়েছে। জুয়ান তা দেখে বললেন, "ওটাই তাহলে গর্ভগৃহ।"

আমরা এরপর সেদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় ঘরের অন্ধকারের মধ্যে থেকে চাপা স্বরে কে যেন বলল, "ওদিকে এগোবেন না।" কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে তাকাতেই দেখি ঘরের এক পাশ থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে অস্পষ্ট দুটো অবয়ব। তার একটা বাচ্চা ছেলের অন্যটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের। আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বৃদ্ধ বললেন, "হাতে একদম সময় নেই। জীবনমৃত্যুর মাঝামাঝি জায়গাতে এখন আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। যা বলছি তা চটপট করুন। কালো কাপড়গুলো এনেছেন তো। ওগুলো চোখে বেঁধে ফেলুন, তারপর গর্ভগৃহের ভেতর ঢুকে যে আপনাদের এখানে এনেছে তার উদ্দেশে বলুন, "বিগ্রহ আমাদের দেখা হয়ে গেছে। কত সোনা এখানে! আমরা কি কিছু নেব?" এমনভাবে চিৎকার করবেন যাতে বাইরে তার কানে সে শব্দ যায়। যতক্ষণ না সে ভিতরে আসছে ততক্ষণ তাকে ডাকতেই থাকবেন। আর গর্ভগৃহতে চোখের কাপড় খুলবেন না। তাহলেই অবধারিত মৃত্যু। চটপট-চটপট..." তাড়া লাগাল লোকটা।

প্রফেসর জুয়ান তার কথা শুনে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা এবার বলে উঠল, "তোমরা ওর কথা না শুনলে বাঁচবে না। নীচের লোকগুলো হয়তো এখনই ওপরে উঠে আসবে!" উত্তজনায় কাঁপছে বাচ্চাটার গলা।

BanglaBook.org

আমরা আর কথা বাড়ালাম না। একটা অজানা আশঙ্কা আমাদের পেয়ে বসেছে। জুয়ানের পকেট থেকে ফেট্টি দুটো বের করে চোখে বেঁধে ফেললাম আমরা। এরপর সেই বৃদ্ধই আমাদের হাত ধরে গর্ভগৃহর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ালের মুখে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যদিও আমাদের চোখ বন্ধ তবু সে ঘরে কেমন যেন একটা অশুভ পরিবেশ অনুভব করলাম আমি।

এরপর সেই বৃদ্ধর কথামতো আমি চিৎকার করে উঠলাম, "মিস্টার কমোলোৎল, মূর্তি দেখা আমাদের হয়ে গেছে, কত সোনা! আমরা কি নেব?" আমার চিৎকার অনুরণিত হতে লাগল বদ্ধ পাথুরে ঘরগুলোতে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিৎকার করার পর অবশেষে তার কানে শব্দ পৌঁছল। বাইরে থেকে তার বিস্ময়সূচক গলার স্বরও শোনা গেল, "কী, মূর্তি দেখা আপনাদের হয়ে গেছে? কী বলছেন আপনারা?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়ে গেছে, কত সোনা এখানে..."

এরপর কিছু সময়ের নিস্তব্ধতা, তারপর মনে হল বাইরে থেকে একটা পায়ের শব্দ যেন একটার পর একটা ঘর অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে আমাদের ঘরের দিকে। ওদিকে অন্য দুজনেরও কোনো সাড়া নেই। তারা মনে হয় কোথাও আত্মগোপন করে আছে। পায়ের শব্দ এসে দাঁড়াল গর্ভগৃহের দরজার বাইরে। তারপর স্পষ্ট শোনা গেল, কমোলোৎলর কণ্ঠস্বর, "আপনারা তো ঘরের ভেতর, সত্যিই আপনারা তাকে দেখতে পাচ্ছেন? সত্যি বলছেন!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা তো তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছি। আপনি তো তাঁকে দেখার জন্য বললেন।"

আবার কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর সম্ভবত কমোলোৎল ঘরের মধ্যে পা রাখলেন। আর তারপরই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় একটা ভয়ংকর চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে! কী যেন একটা মাটিতে ছিটকে পড়ল! কমোলোৎল-র চিৎকার, নানা রকম শব্দ ভেসে উঠল চারিদিকে। আমি আর জুয়ান শক্ত করে ধরে আছি পরস্পরের হাত। সেই গোলমালের মধ্যেই সেই বৃদ্ধের হাত আমার দেহ স্পর্শ করল। তিনি বললেন, "চলুন, এবার এ ঘরের বাইরে চলুন।"

তার হাত ধরে সে ঘরের বাইরে পা রাখতেই আমাদের চোখের পর্দা সরিয়ে দিলেন তিনি। দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য—কমোলোৎল গর্ভগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে চিৎকার করে ঘুরপাক খাচ্ছেন! যেন তিনি খুঁজছেন বাইরে যাবার রাস্তা। চিৎকার করতে করতে বার বার পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছেন তিনি। উনি কেন এমন করছেন তা কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা। দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে একসময় তিনি বাইরে যাবার রাস্তা পেলেন, তারপর অন্য ঘর দুটো অতিক্রম করে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে

BanglaBook.org

এলেন, আর তার পিছন পিছন আমরা চারজনও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চাঁদের আলোতে মন্দিরের সামনে ছোট্ট পাথুরে চত্বরে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করতে লাগলেন কমোলোৎল। যেন আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই। হঠাৎ একটা কাণ্ড হল। প্রফেসর জুয়ান হঠাৎ সেই বৃদ্ধর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "উনি এরকম করছেন কেন?"

বৃদ্ধ কোনো জবাব দিলেন না। কিন্তু কথাটা মনে হল কানে গেল কমোলোৎল-র। মূহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর কোমর থেকে একটা ছুরি খুলে নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আক্রোশে চিৎকার করে ছুটে এলেন আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাঁচাতে ছিটকে সরে গেলাম আমরা। ছুরি হাতে আমাদের পাশ দিয়ে হাওয়া কেটে প্রচণ্ড জোরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন কমোলোৎল, কিন্তু চত্বরের কিনারে এসে তিনি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না, একটা আর্ত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটা মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওপর থেকেও আমরা শুনতে পেলাম তার দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ার শব্দ আর তার পরক্ষণেই নীচে প্রতীক্ষারত সমবেত জনতার উল্লাস। বলি গ্রহণ করেছেন দেবতা তেজকাৎলিপোকা!

সেই বৃদ্ধ এবার বললেন, "চলুন, এবার আমাদের পালাতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের লোকগুলোর ভুল ভেঙে যাবে, আমাদের ধরতে ওপরে উঠে আসবে ওরা।" এই বলে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে আবার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধ। আমরা তাদের অনুসরণ করলাম। দ্বিতীয় ঘরটায় ঢুকে অন্ধকার হাতড়ে একটা মশাল কোথা থেকে এনে জ্বালিয়ে ফেলল বাচ্চাটা। আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। ঘরের এক কোনোয় রাখা আছে বীভৎস এক মূর্তি। সে মূর্তি যেন মূর্তিমান জিঘাংসার প্রতীক। তার দন্তশোভিত বিরাট মুখগহ্বর যেন গিলে খেতে আসছে আমাদের। অন্ধকারের জন্য আমরা আগে খেয়াল করিনি এ মূর্তি। বেশ কিছু নর করোটিও ছড়িয়ে আছে মূর্তির বেদির কাছে। সেই বৃদ্ধ এবার তার পোশাকের ভিতর থেকে সেই ফ্লিন্ট পাথরের ছুরি বের করে তুলে দিলেন বাচ্চা ছেলেটার হাতে। ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে সেই ছুরিটা দিয়ে মূর্তির বক্ষে একটা ছিদ্রে চাবির মতো ঘোরাতেই ঘড় ঘড় শব্দে ফাঁক হয়ে গেল মেঝের কিছুটা অংশ। মশালের আলোতে আমাদের চোখে পড়ল সার সার সিঁড়ি নী চের দিকে নেমে গেছে। বৃদ্ধ বললেন, "এই পথেই মন্দিরে প্রবেশ করেছি আমরা। ওই পথেই আমাদের যেতে হবে।"

প্রফেসর বললেন, "কিন্তু কোথায় যাব আমরা?"

বৃদ্ধ বললেন, "এই পিরামিড থেকে অনেক দূরে। চলুন, এখন আর কথা বলার সময় নেই। ওরা নিচ থেকে ওপরে উঠে এল বলে! শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

আমরা এবার শুনতে পেলাম সত্যিই জনতার কলরব। পিরামিডের গায়ের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। তাদের পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

বৃদ্ধ এবার ছেলেটার কাঁধ ধরে সেই গহ্বরে প্রবেশ করলেন। আর তাকে অনুসরণ করলাম আমরা। একের পর এক কক্ষ, সুড়ঙ্গ, সিঁড়ি পার হয়ে তাদের পিছন পিছন আমরা ছুটতে থাকলাম। আমাদের সে পথে কত অদ্ভুত জিনিস যে চোখে পড়ল তার হিসেব নেই। বীভৎস সব মূর্তি! তাদের সব কিছুর ভয় বা প্রলোভন উপেক্ষা করে ছুটে চললাম আমরা। বাচ্চা ছেলেটাই যেন পথ প্রদর্শক। তার কাঁধ ছুঁয়ে বৃদ্ধ আর তার পিছনে আমরা। ঘণ্টাখানেক ছোটার পর অবশেষে একসময় আমরা সুড়ঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম চন্দ্রালোকিত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

৯

একটা পাথরের ওপর বসে ছিলাম আমরা। আমাদের সামনেই বসে আছে সেই বৃদ্ধ আর বাচ্চা ছেলেটা। বৃদ্ধর টুপিটা আগেকার মতোই তার মুখমণ্ডলের ওপরের অংশকে ঢেকে রেখেছে। চাঁদের আলোতে বেশ রহস্যময় দেখাচ্ছে তাকে। বাচ্চাটা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের আশেপাশে আর কোনো পিরামিড চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে সেই প্রাচীন নগরীকে আমরা অনেক দূরে ফেলে এসেছি। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর প্রফেসর জুয়ান সেই বৃদ্ধর উদ্দেশে বললেন, "আপনি এবার আমাদের সব কথা খুলে বলুন। এখানকার কোনো ঘটনাই তো বোধগম্য হল না। আপনি একজন ইওরোপীয় বলেই আমাদের ধারণা। আপনি এখানে কী করছেন?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, "তাহলে প্রথমে আমার কাহিনীটাই আপনাদের আমি সংক্ষেপে বলি।"

একটু দম নিয়ে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন, "আপনাদের ধারণাই ঠিক, আমি একজন ইউরোপীয়, নাম রিচার্ড বার্টন। ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। পেশায় আমি ছিলাম ইঞ্জিনিয়ার। প্রাচীন স্থাপত্য নিয়ে আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল। সে বিষয় নিয়ে আমি পড়াশোনা করতাম। বছর তিরিশ আগে আমি আর আমার স্ত্রী প্রাচীন স্থাপত্যের জাদুঘর মেক্সিকোতে পদার্পণ করি। এখানে আসার পর লাল মানুষদের কীর্তিগুলো দেখে আমার মনে এক প্রশ্নের উদয় হয়। প্রাচীন এক অর্ধসভ্য জাতি, যারা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানত না, লোহার ব্যবহার জানত না, তারা কীভাবে বিশাল পাথর কেটে মন্দির-মূর্তি রচনা করল? তাহলে তাঁদের কাছে কি এমন কোনো কিছু ছিল যা দিয়ে সহজেই পাথর কাটা যায়? এ প্রশ্নের উদয় হতেই তার উত্তরের সন্ধানে নেমে পড়লাম আমি। এখানকার বিখ্যাত লাইব্রেরি, মিউজিয়ামগুলোতে স্থাপত্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘুরতে লাগলাম আমি। একদিন একটা বইতে এক অদ্ভুত তথ্য পেলাম। কয়েকশো বছরের প্রাচীন বইতে লেখা ছিল, 'প্রাচীন মন্দির নগরীর তেজকাৎলিপোকা পাথরও গলিয়ে দিতে পারেন।' একথাটা আমার

BanglaBook.org

কাছে খুব ইঙ্গিতবাহী মনে হল। কিন্তু, প্রাচীন মন্দিরময় নগরী তো এখানে অনেক আছে। অ্যাজটেকদের রাত্রি ও জাদুবিদ্যার দেবতা কোনো প্রাচীন নগরীতে অবস্থান করছেন তা জানব কীভাবে? খুঁজতে লাগলাম আমি। এ পরিশ্রমের ফল মিলল। একদিন তিওতিহুকান পিরামিড চত্বরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল পেশায় ডাক্তার এক ভদ্রলোকের। সে ভদ্রলোক বললেন, সে মূর্তির খবর জানা আছে তার। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। সে ভদ্রলোকের হাতেও আঁকা ছিল সাপের উল্কি। যদিও তার সঠিক অর্থ আমার তখনও জানা ছিল না। তা জানা থাকলে হয়তো সতর্ক হতাম। যাইহোক তার সঙ্গে আজ থেকে আঠারো বছর আগে অ্যাজটেক ক্যালেন্ডারের শেষ দিন আমরা উপস্থিত হলাম মন্দির নগরীতে। রাতে নগরীতে উৎসব হবে। সেই ভদ্রলোক আমাদের দেখাবেন সেই মায়াময় মূর্তি, জাদুর দেবতা তেজকাৎলিপোকা, যিনি পাথর গলাতে পারেন!

সারাদিন তাকে দেখার জন্য প্রতীক্ষা করলাম আমি। রাতে সে লোক এল। ওই মন্দিরে নাকি স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাই আমি একলাই হাতে সাপ আঁকা লোকটার সঙ্গে উঠলাম পিরামিডের ওপর। আজকের মতো সেদিনও নীচে প্রতীক্ষা করছিল সমবেত জনতা। সে লোকটা নিজে মন্দিরে না ঢুকে যেমন আপনাদের কমোলোৎল নির্দেশ দিয়েছিল তেমনই আমাকে বলল, বিগ্রহ দর্শন করে আসার জন্য। সরল বিশ্বাসে আমি পৌঁছে গেলাম পিরামিডের ওপর মন্দিরের গর্ভগৃহে। মুহূর্তের জন্য আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেই বীভৎস মূর্তি। আর তারপরই...!" কথা থামিয়ে কেঁপে উঠলেন ভদ্রলোক।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, "তারপর কী হল?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক তার টুপিটা সরিয়ে নিলেন। চাঁদের আলো এসে পড়ছে তার মুখে। আমি দেখতে পেলাম ভদ্রলোকের চোখের মণি দুটো সম্পূর্ণ সাদা! তিনি দৃষ্টিহীন!

আমি শিউরে উঠে বললাম, "তার মানে আমাদেরও কি এখানে দৃষ্টিহীন করার জন্য আনা হয়েছিল?"

বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ। প্রথমে আপনাদের দৃষ্টিহীন করে, তারপর ফ্লিন্ট পাথরের ছুরি দিয়ে বলি দেওয়া হত। আমি অবশ্য সেবার বেঁচে গেছিলাম আমার দৃষ্টি হারিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই দৈবক্রমে ভূমিকম্প হয়েছিল। ওরা ভয় পেয়ে গেছিল। রাত শেষ হয়ে 'শূন্য মাস' পড়ে যাওয়াতে বেঁচে যাই আমি। দেবতার প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হয় না। তারপর থেকে এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি।"

আমি জানতে চাইলাম, "আচ্ছা ওই দেবতার চোখে কী আছে?"

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "সম্ভবত লেসার রশ্মি জাতীয় কিছু, যা দিয়ে পাথর কাটত ওরা। এখানকার লোকরা তাই মূর্তির সামনে যায় না। কমোলোৎলও কোনোদিন যায়নি ওর

BanglaBook.org

সামনে। আপনাদের কথা শুনে কমোলোৎল ফাঁদে না পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল আপনাদের। দরজার সামনে দাঁড়াতেই আমি ওকে ঠেলে দিয়েছিলাম ঘরের ভেতর। ধর্মীয়ভাবে ও খুব হিংস্র ছিল। নিজের হাত কেটে নিবেদন করেছিল দেবতাকে। এখানকার অনেকেই অঙ্গ নিবেদন করে দেবতাকে।" বৃদ্ধর কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল কমোলোৎলের অঙ্গহীন সঙ্গীদের কথা।

প্রফেসর জুয়ান বললেন, "আপনি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করেননি?"

বৃদ্ধ বললেন, "সর্বত্র ওরা আছে। পালানো কি সহজ? এই ছেলেটাকে ওরা এখানে ধরে এনেছিল বলি দেবার জন্য। বহু বছর পর এই ছেলেটার সাহায্যে আমার স্ত্রীকে নিয়ে তিওতিহুকান পর্যন্ত পালাতে সক্ষম হয়েছিলাম আমি। সেখানেই তো ঘটনাচক্রে আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা। কিন্তু আমার স্ত্রী ধরা পড়ে গেলেন। আমাদের আবার ফিরে আসতে হল এখানে। কিন্তু তাকে শেষপর্যন্ত আমি বাঁচাতে পারলাম না। ওরা অনেক আগেই তার জিভ কেটে দিয়েছিল। বিকালে তারা ওকে পালকভূষিত সর্পদেব কোয়েৎজালের মন্দিরে বলি দিয়ে তার দেহ নিয়ে এসেছিল তেজকাৎলিপোকার মন্দিরে ধর্মাচারের জন্য।"

তাঁর কথা শুনে চমকে উঠলাম আমি। বুঝতে পারলাম আমাদের সঙ্গে আসা সেই ইউরোপীয় ভদ্রমহিলাই হলেন তাঁর স্ত্রী।

রাত শেষ হয়ে আসছে। শুকতারা ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা এবার এগোন। উত্তরে কিছুটা এগোলেই হাইওয়ে পাবেন। সেখানে গাড়ি চলাচল করে। সভ্য শহরে ফিরে যেতে পারবেন আপনারা। আমি যাব দক্ষিণে, এই ছেলেটার গ্রামে। আর এটা আপনারা রাখুন," এই বলে তিনি ফ্লিন্ট পাথরের ছুরিটা এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। আমি ছুরিটা নিলাম।

বাচ্চা ছেলেটা একবার আমাদের দিকে হাত নেড়ে বৃদ্ধকে নিয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের নির্দেশ মতো আমরাও হাঁটতে লাগলাম উত্তরমুখী। আমাদের অনেক পিছনে পড়ে রইল তেজকাৎলিপোকার পিরামিড।

BanglaBook.org

নেকড়ের নিমন্ত্রণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো সার্জারি বিভাগের সদ্য পাশ করা তরুণ চিকিৎসকদের সামনে বক্তৃতা করছিলেন বিখ্যাত নিউরো সার্জেন প্রফেসর হ্যারল্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ। মাত্র কয়েকদিন আগেই নিউরো সার্জারি বিভাগে সর্বোচ্চ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা দেশে ফিরে যাবার আগে মিলিত হবার জন্য আয়োজন করেছিল এই সভার।

প্রফেসর তার বক্তৃতা শেষ করলেন এইভাবে—'আমি আমার সাধ্যমতো তোমাদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছি। তবে আমি তো আর প্রফেসর উল্‌ফ নই, কিছু সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আমারও আছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তোমরা যা শিখেছ তা এই পেশার পক্ষে যথেষ্টই বলা যায়। আশা করি দেশে ফিরে তোমরা প্রত্যেকেই স্নায়ু শল্যচিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করবে।' তুমুল করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করলেন প্রফেসর হ্যারল্ড।

দর্শকাসনে প্রথম সারিতেই বসেছিল সুজয়। সে এবার নিউরো সার্জারি বিভাগে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছে। প্রফেসর হ্যারল্ডের প্রিয় ছাত্র সে। কিন্তু লন্ডন তথা পৃথিবীর অন্যতম স্নায়ু শল্যচিকিৎসক হ্যারল্ড তার বক্তৃতা শেষে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে 'প্রফেসর উল্‌ফ বলে যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করলেন, তিনি কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অধ্যাপকরাও তো কোনোদিন বলেননি এই নাম! সবাই তো বলেন নিউরো সার্জারি সংক্রান্ত ব্যাপারে লন্ডন শহরে শেষ মন্তব্য করার লোক হ্যারল্ডই। সুজয় ভেবে নিল হ্যারল্ডের কাছ থেকে তার কৌতূহলের নিরসন করতে হবে।

হ্যারল্ডের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই সভাও শেষ হয়ে গেল। মঞ্চ থেকে নামার সময় সুজয়কে ইশারা করলেন প্রফেসর। সে ইঙ্গিত বুঝতে পারল। প্রিয় ছাত্রকে তাঁর বাড়িতে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছেন তিনি। তাঁর গাড়িতেই সুজয়কে এখন আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে। সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে রাতে হোস্টেলে ফিরবে বলে কনফারেন্স

BanglaBook.org

রুমের বাইরে বেরিয়ে সুজয় কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে বসল প্রফেসর হ্যারল্ডের গাড়িতে। ঝাঁ চকচকে আলোকোজ্জ্বল নগরীর রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটল লন্ডনের এক অভিজাত অঞ্চলে হ্যারল্ডের বাড়ির উদ্দেশে।

প্রফেসরের বাড়িতে আগেও বেশ কয়েক বার এসেছে সুজয়। কম্পাউন্ড ঘেরা ভিক্টোরিয়া আমলের বাড়িটাতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন প্রফেসর। সুজয়ের সমবয়সি তাদের একমাত্র ছেলে গ্লাসগোতে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং য়ের পাঠ নিচ্ছে। মিসেস হ্যারল্ড হাসিখুশি স্নেহশীল মহিলা। সুজয় তার ছেলের সমবয়সি বলেই তিনি হয়তো কিছুটা বাড়তি স্নেহ করেন সুজয়কে। সে প্রফেসরের বাড়িতে পৌঁছবার পর মিসেস হ্যারল্ড বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে খাতিরযত্ন করে খাওয়ালেন সুজয়কে। ডিনার পর্ব সাঙ্গ হলে প্রফেসরের স্টাডিতে মোমের আলোতে গল্প করতে বসল তিনজন।

প্রশ্নটা সুজয়ের মনে ঘুরঘুর করছিল অনেক্ষণ ধরে। কিছু হালকা আলাপ আলোচনার পর সুযোগ বুঝে প্রফেসরকে প্রশ্নটা করে ফেলল, 'আপনি যে আজ বক্তৃতায় প্রফেসর উল্‌ফের নাম বললেন, তিনি কে? তার নাম কোনোদিন শুনিনি তো!'

সুজয় প্রশ্নটা করতেই মিসেস হ্যারল্ড যেন একটু চমকে উঠে বললেন, 'ও গড!' প্রফেসর হ্যারল্ড মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বললেন, 'বক্তৃতা করতে গিয়ে অনেকদিন পর ও নাম আচমকাই মুখে চলে এসেছিল আমার। অসম্ভব প্রতিভাধর মানুষ সে। আমার মতে নিউরো সার্জারিতে ওর মতো জ্ঞান আর দক্ষতা ইংল্যান্ডে আর কারও নেই। চিকিৎসাশাস্ত্র বাদ দিয়েও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, যেমন, পদার্থবিদ্যা-রসায়ন-ইঞ্জিনিয়ারিং—এ সবেতেই ওর পাণ্ডিত্য অসীম। তুমি যদি ওর সংস্পর্শে আসতে তাহলে আরও বেশি শিখতে। একটা চুলের মতো নার্ভকেও আশ্চর্যভাবে ও লম্বালম্বি চিরে ফিলতে পারে। এমনই দক্ষতা ওর! তবে লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গেই অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছিল। তার সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতাও ছিল। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিল। বার্মিংহামে পূর্বপুরুষদের বিশাল দুর্গবাড়িতে নানারকম গবেষণা করে দীর্ঘদিন সময় কাটাচ্ছে সে।'

মিসেস হ্যারল্ড এবার স্বামীর কথা শুনে বললেন, 'গবেষণা না ছাই, লোকে তো বলে কবরখানা ঘেরা ওই প্রাচীন বাড়িতে বসে প্রেতচর্চা করে লোকটা। কেউ কেউ তো বলে উল্‌ফ আসলে মানুষ নয়। দিনেরবেলাতে তাকে কোনোদিন দেখা যায় না। রাতে যে ওই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় সে আসলে উল্‌ফের প্রেতাত্মা।'

প্রফেসর স্ত্রীর কথায় মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'ব্যাপারটা আসলে ঠিক নয়। উলফ প্রতিবেশীদের কারওর সঙ্গে মেশে না। পল্লি অঞ্চলে একাকী কেউ বাস করলে গ্রাম্য মানুষরা ওরকম নানা গল্প ছড়ায়।''

BanglaBook.org

সুজয় লোকটার পরিচয় শুনে কৌতূহলী হয়ে বলল, "তাঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে? তাঁর কাছে কিছু শিখতে পারলে ভাগ্যবান মনে করতাম নিজেকে।"

প্রফেসর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, "সে অর্থে প্রায় কুড়ি বছর তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ তেমন নেই। লন্ডন শহরের কোলাহল থেকে ও নিজেকে দূরে রাখে। বছর পাঁচেক আগে ও আমাকে শেষ একটা চিঠি পাঠিয়েছিল নিউরো সার্জারি সংক্রান্ত কাজকর্মের বিষয়ে। পাছে কেউ ওর কাজে ব্যাঘাত ঘটায় তাই ওর বাড়িতে টেলিফোন লাইন নেই। আমি ওর নামে তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি। তার সঙ্গে তোমার সার্টিফিকেটের একটা প্রতিলিপি যুক্ত করে তুমি একটা চিঠি লেখো ওকে। দ্যাখো যদি ওর সাড়া মেলে।"

সুজয় বলল, "তাহলে চিঠিটা লিখে দিন। দেখি যদি ওঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

মিসেস হ্যারল্ড আঁতকে উঠে সুজয়কে বললেন,"তুমি সত্যিই সেখানে যাবে নাকি? আমার এক বোনপো থাকে ওদিকে। সে বলছিল উল্‌ফ ক্যাসেলের ত্রিসীমানায় কেউ যায় না। রাতে নাকি ওই কবরখানা থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসে। দপ করে জ্বলে ওঠে নীলাভ আলো! একবার গ্রামেরই এক চোর রাতের বেলায় গিয়েছিল ওদিকে। পরদিন মৃত অবস্থায় কবরখানার বাইরের রাস্তায় পাওয়া যায় তাকে। লোকটার দেহে কোনো ক্ষতচিহ্ন না থাকলেও চোখে-মুখে ছিল স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ!"

প্রফেসর হ্যারল্ড স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বললেন, "কেন বাজে গল্প ওকে শোনাচ্ছ? ও যদি সত্যিই উল্‌ফের সংস্পর্শে আসতে পারে তবে ও আরও নতুন কিছু শিখতে পারবে।"

প্রফেসরের ধমক খেয়ে মিসেস হ্যারল্ড রাগ করে অন্য ঘরে চলে গেলেন। তবে যাবার আগে স্নেহশীলা মায়ের মতো সুজয়কে বলে গেলেন, "তুমি কিন্তু ওখানে যেয়ো না। উল্‌ফ নাকি 'উলফ'—মানে 'নেকড়েও' পোষে।"

BanglaBook.org

২

মিসেস হ্যারল্ড যাই বলুন না কেন, প্রফেসর কিন্তু সত্যিই একটা চিঠি লিখে দিলেন প্রফেসর উল্‌ফের নামে। তারপর সেল্‌ফ থেকে পুরোনো একটা ফটোগ্রাফ বার করে সুজয়ের সামনে মেলে ধরে বললেন, "এই হল কুড়ি বছর আগে উল্‌ফের ছবি। অনেক বছর তাকে না দেখলেও অনুমান করতে পারি তার চুলগুলো এখন আমারই মতো সাদা হয়ে গেছে। তোমার তাকে চেনার সুবিধার জন্য ছবিটা দেখালাম।" সুজয় মোমের আলোতে ছবিটা দেখল। একজন মধ্যবয়সি মানুষের ছবি। মাথার পেছনে টেনে বাঁধা ঘন কালো চুল। ছুঁচলো চিবুক। প্রশস্ত কপাল আর তিক্ষ্ণ নাসা যেন পরিচয় দিচ্ছে তাঁর মেধাশক্তির। সবচেয়ে উজ্জ্বল তাঁর চোখ দুটো। বুদ্ধিদীপ্ত সেই চোখ যেন ছবির ভিতর

থেকে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে। একটা রহস্যময় দৃষ্টি আছে সেই চোখে। সুজয় বেশ কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে সেটা ফেরত দিল প্রফেসরকে। তাঁর বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সময় প্রফেসর এরপর শুধু বললেন,'তবে লোকটা তো একটু পাগলাটে ধরনের। কাজেই আশাহত হলে দুঃখ পেয়ো না।"

প্রফেসরের বাড়ি থেকে হোস্টেলে ফিরে এসে বেশ উত্তেজনা অনুভব করল সুজয়। চোখ বন্ধ করলেই সে দেখতে পাচ্ছে ছবির সেই লোকটা, প্রফেসর উল্‌ফ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পরদিন সকালে উঠেই প্রফেসর উল্‌ফের উদ্দেশে একটা চিঠি লিখে ফেলল সে। প্রফেসর হ্যারল্ডের চিঠিতে উল্‌ফের ঠিকানা লেখা ছিল। সেই ঠিকানাতে হ্যারল্ডের কথামতো দুটো চিঠি আর প্রথম বিভাগে প্রথম হবার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি সেদিনের ডাকেই পাঠিয়ে দিল সে।

দিন তিনেকের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে চিঠির জবাব এসে গেল। নোংরা একটা কাগজে কালচে লাল কালির আঁকাবাঁকা হরফে লেখা চিঠি। তার ভাষা সংক্ষিপ্ত ও কর্কশ।

"আপনার আবেদন ও সার্টিফিকেট দেখলাম। তবে ওই সার্টিফিকেট আমার কাছে নিতান্ত কাগজের টুকরো মাত্র। আমার কাছে শিক্ষানবিশ থাকতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে। তাতে কৃতকার্য না হলে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য গলাধাক্কা খাবেন। যেমন এর আগে কয়েকজন খেয়েছেন। আপনার কোনো ক্ষতির দায়িত্ব আমার নয়। পরীক্ষা দিতে রাজি থাকলে আগামী ৩১ অক্টোবর রাত দশটায় বার্মিংহাম ক্রসিংয়ে অপেক্ষা করবেন। অবশ্যই একলা আসবেন। আমার গাড়ি সেখানে আপনাকে নিতে আসবে।

স্বাক্ষর

মার্টিমার উল্‌ফ

উল্‌ফ ক্যাসেল, বার্মিংহাম।"

BanglaBook.org

চিঠির ভাষাটা বেশ আশ্চর্য লাগল সুজয়ের। তারপর চিঠিটা খুঁটিয়ে দেখে চমকে উঠল সে। মৃদু আঁশটে গন্ধ আছে কাগজটাতে। সম্ভবত চিঠির লাল কালিটা হল রক্ত। মুহূর্তের জন্য মিসেস হ্যারল্ডের কথাগুলো মনে হল তার। বেশ অদ্ভুত লোক তো মিস্টার উল্‌ফ। রক্ত দিয়ে চিঠি লেখেন! কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুজয় সিদ্ধান্ত নিল এরকম অদ্ভুত লোককে অন্তত একবার চাক্ষুষ করতে হবে। প্রফেসর হ্যারল্ডের মতে যিনি লন্ডনের শ্রেষ্ঠ স্নায়ু শল্যচিকিৎসক।

৩

নির্ধারিত দিনে লন্ডন থেকে রাত ন-টা নাগাদ বার্মিংহামে পৌঁছে গেল সুজয়। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হল বার্মিংহাম ক্রসিংয়ের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হাইওয়ে ধরল

গাড়ি। বেশ ঠাণ্ডা এদিকটাতে। এ অঞ্চলে আগে কোনোদিন আসেনি সুজয়। গাইড বুকে শুধু লেখা আছে বার্মিংহাম ক্রসিংয়ের মাইল পাঁচেক দূরে নর্মান আমলের প্রাচীন এক কবরখানা আছে, আর আছে এক প্রাচীন জমিদারবাড়ি। সম্ভবত ওটাই উল্‌ফ ক্যাসেল।

নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই ক্রসিংয়ে এসে পৌঁছল সুজয়। জনমানবহীন জায়গা। ফাঁকা হাইওয়ে চলে গেছে আরও উত্তরে। পশ্চিমে ফাঁকা মাঠ আর পূর্ব দিকে উইলোর জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা মেঠো রাস্তা এসে মিলেছে হাইওয়ের সঙ্গে। তারপর সেটা হাইওয়ে ছেদ করে এগিয়েছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। এজন্যই জায়গাটার নাম মনে হয় ক্রসিং। গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে ভাড়া মেটাবার সময় ড্রাইভার হঠাৎ কৌতূহলি হয়ে বলল, "কোথায় যাবেন আপনি? এত রাতে এখানে কিন্তু কোনো গাড়ি পাবেন না। আশেপাশে জনবসতি নেই।" সুজয় জবাব দিল, "উল্‌ফ ক্যাসেল যাব। গাড়ি আসবে আমাকে নিতে।"

লোকটা চমকে উঠে বলল, "উল্‌ফ ক্যাসেল। এত রাতে! ওটা তো কবরখানা। আজ কী দিন খেয়াল আছে তো? ৩১ অক্টোবর 'হ্যালোউইন ডে'। মৃত আত্মারা কবর ছেড়ে এ রাতে উঠে আসে। ওখানে যাবেন?" সুজয় বলল, "হ্যাঁ, বিশেষ কাজ আছে।"

লোকটা জবাব শুনে কয়েক মুহূর্ত বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে নিজের বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল ফেরার জন্য। চাঁদের আলোতে নির্জন রাস্তায় একলা দাঁড়িয়ে সুজয়।

ঠিক রাত দশটায় সুজয় দেখতে পেল একটা গাড়ির বিন্দুর মতো দুটো হেড লাইটের আলো। উইলো বনের কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে হাইওয়ের দিকে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সুজয়ের ঠিক সামনেই। লম্বাটে, পুরোনো মডেলের কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি। হলদে ম্যাটম্যাটে আলো ছড়াচ্ছে হেডলাইট দুটো। সামনের কালো কাঁচটা সামান্য নামল। চালকের আসন থেকে একজন বলল, "আপনি নিশ্চই উল্‌ফ ক্যাসেলে যাবেন? তাহলে উঠে বসুন।"

সুজয় গাড়িতে উঠে পড়ল। হাইওয়ে থেকে নেমে উইলো বনের ভেতর দিয়ে দুলতে দুলতে এগোল গাড়ি। গাড়ির ভিতর অন্ধকার। কেমন যেন একটা পুরোনো গন্ধ ভেতরটাতে। চালকের আসন আর সুজয়ের বসার জায়গার মধ্যে বেশ অনেকটা ফাঁক। ড্রাইভারের উঁচু কলারের ওভারকোটের ওপরে সাদা চুল সমেত মাথার কিছু অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। আলাপ জমাবার জন্য সুজয় তার উদ্দেশে বলল, "শহরতলিতে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে! আশেপাশে কোনো লোকজন থাকে না?"

লোকটা কোনো জবাব দিল না। সুজয় এবার জানতে চাইল উল্‌ফ ক্যাসেল পৌঁছতে কত সময় লাগবে?"

লোকটা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে অদ্ভুত জবাব দিল, "না পৌঁছলে বলতে পারব না।"

BanglaBook.org

সুজয় বুঝতে পারল তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা তার নেই। লোকটা মনে হয় তার মালিকের মতোই অদ্ভুত। একথা ভেবে বাইরে চোখ রাখল সুজয়। আধো অন্ধকারে রাস্তার দু-পাশে গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা যেন এগিয়েছে কোনো ভৌতিক জগতের দিকে।

একসময় জঙ্গল শেষ হল। চাঁদের আলোতে দেখা দিল এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার মধ্যে জেগে আছে অসংখ্য বেদি আর তার মাথায় সার সার ক্রুশ চিহ্ন। চাঁদের আলোতে ধবধব করছে সেগুলো। মাঠের অপর প্রান্তে অনেক দূরে প্রাচীন এক স্থাপত্য যেন দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ওটাই উল্‌ফ ক্যাসেল। একটা ভাঙা তোরণ অতিক্রম করে প্রাচীন কবরখানায় প্রবেশ করল গাড়ি। তারপর খুব ধীর গতিতে কবরের সারির পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল। চারপাশে শুধু কবর আর কবর। প্রাচীন কবরগুলোর মাথায় ক্রুশ কোথাও হেলে পড়েছে, কোথাও আবার শ্বেতপাথর ফুঁড়ে মাথা তুলেছে ঝোপঝাড়।

বাইরের দিকে চোখ রেখে চলেছিল সুজয়। হঠাৎ কিছু দূরে একটা কবরের বুক ফুঁড়ে একটা নীল আলো দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। এরপর কিছু দূরে আর একটা, তারপর আরও একটা।

সুজয়ের মনে পড়ে গেল মিসেস হ্যারল্ডের কথা। তিনি বলেছিলেন এই ভৌতিক আলোর ব্যাপারে। সুজয় একটু বিস্মিত হয়ে ড্রাইভারকে বলল, "ও কীসের আলো?"

সুজয় তার উত্তর না পেয়ে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল চালকের আসন শূন্য। সেখানে কেউ নেই। অথচ গাড়িটা চলছে। ড্রাইভার কি অসুস্থ হয়ে সামনে ঢলে পড়ল? সামনে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে সুজয় কপালে ঠোক্কর খেল। ড্রাইভারের সিটের ঠিক পিছনেই স্বচ্ছ কাচের পার্টিশন আছে। সেটা আগে আধো অন্ধকারে সে বুঝতে পারেনি। তবে তার ভিতর দিয়ে ওপাশটা দেখা যাচ্ছে, চালকের আসনে কেউ নেই। তবুও স্টিয়ারিংটা ঘুরছে। কবরগুলোকে কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গাড়ি। সুজয়ের মাথার ভিতরটা কেমন যেন গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে বলে উঠল— "আপনি কোথায়?" ঠিক সেই সময় ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। আর গাড়ির চারপাশের কবরগুলোতে জ্বলে উঠতে লাগল নীল আলো। আর এরপরই জানলার পাশে একটা বিরাট কবরের মাথার ক্রুশটা সশব্দে ভেঙে পড়ল, ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেল কবরের উপরিভাগ। তার ভিতর থেকে উঠে এসল একটা অবয়ব। ঠিক সেই একটা নীল আলো ঝলসে উঠল। সেই আলোতে সুজয় দেখল কবর থেকে উঠে বসেছে একটা কঙ্কাল। সে তার রক্তমাংসহীন হাত দিয়ে টেনে ধরতে চাইছে গাড়ির চাকা। সুজয়ের মনে হল— সে কি ঠিক দেখছে! তাহলে কি মিসেস হ্যারল্ডের শোনা গল্প ঠিক? হ্যালোউইন ডে-তে কি সত্যিই জেগে ওঠে প্রেতাত্মারা! তা কী করে সম্ভব! কিন্তু চোখকে সে অবিশ্বাস করবে কীভাবে?

BanglaBook.org

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তার যাত্রাপথের দু-পাশে ঘটতে লাগল অবিশ্বাস্য সব ঘটনা! কোথাও কবর ফুঁড়ে উঠে আসছে কঙ্কাল! কোথাও রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে কবন্ধ! কোথাও আবার শোনা যাচ্ছে পৈশাচিক হাসি। গাড়িটা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে এসব কিছু। মনটাকে শক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সুজয়। নিজের মনকে সে বার বার বলার চেষ্টা করতে লাগল, এ হতে পারে না! এ হতে পারে না! তার এতদিনের শেখা বিজ্ঞান কিছুতেই মিথ্যা হতে পারে না! দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তার লড়াই হতে লাগল মনের মধ্যে। একসময় কোথা থেকে যেন ছুটে এল একপাল নেকড়ে। তাদের দেহগুলো যেন অন্ধকারে জ্বলছে। চাঁদের আলোতেই ঝিলিক দিচ্ছে তাদের ধবধবে হিংস্র দাঁতের পাটি। গাড়িটার সঙ্গে তারা ছুটতে লাগল। ভিতরে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল সুজয়। দমবন্ধ করা আতঙ্কে তার মনে হতে লাগল এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা ঘণ্টা।

এগিয়ে চলল গাড়ি। কতক্ষণ এভাবে সে গাড়িতে বসে রইল খেয়াল নেই তার। একসময় সে খেয়াল করল বিশাল এক তোরণের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে গাড়ি। নেকড়েগুলো সেই তোরণে পৌঁছে থেমে গেল। একটা অন্ধকার টানেল অতিক্রম করে বিরাট একটা আলোকোজ্জ্বল কক্ষে পৌঁছে থেমে গেল গাড়ি। তার দরজাও খুলে গেল।

আলো দেখে একটু ইতস্তত করে গাড়ি ছেড়ে নামল সুজয়। প্রাচীন কক্ষ, ছাদ অনেক উঁচুতে। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে বিভিন্ন তৈলচিত্র, প্রাচীন ঢাল-বর্শা অস্ত্র। সম্ভবত এটাই নর্মান আমলের প্রাচীন উল্‌ফ ক্যাসেল। সে দেখল একজন লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাঁর তীক্ষ্ণ নাসা, উঁচু কপাল, আর তার নীচে হ্যারল্ডের দেখানো ফটোগ্রাফের সেই উজ্জ্বল চোখ। মাথার চুল শনের মতো সাদা। পরনে কলার উঁচু ওভারকোট। প্রফেসর উল্‌ফ!

লোকটা সুজয়ের সামনে এসে করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল। সুজয় স্পর্শ করল সেই হাত। সেই হাত যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। এরপর নিঃশব্দে হাসল লোকটা। সুজয় স্পষ্ট দেখতে পেল প্রফেসরের ঠোঁটের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ক্যানাইন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর চুল আর কোট দেখে সুজয়ের মনে হল এই যেন তার গাড়ির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া চালক! হয়তো এরপর সে সত্যি সংজ্ঞা হারাত। কিন্তু তার আগে মনের সব শক্তি একত্রিত করে লোকটার চোখে চোখ রেখে বলে উঠল, "আপনি নিশ্চয় প্রফেসর উল্‌ফ? আমি আপনার কাছে পরীক্ষা দিতে এসেছি।"

ভদ্রলোক তার কথা শোনা মাত্রই তাঁর নকল শ্বদন্ত দুটো খুলে ছুড়ে ফেলে সুজয়ের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, "আরে পরীক্ষা তো তুমি দিয়েই ফেলেছ। আর শেষ পরীক্ষাতেও এত ভালোভাবে পাশ করবে ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম তুমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায়

BanglaBook.org

এখানে আসবে। আর কাল সকালেই তোমায় বিদায় করব। যেমন এর আগে কয়েকজনকে করেছি। তোমাকে আমার সহকারী করতেই হবে।"

মুহূর্তের মধ্যেই হাসি ফুটে উঠল সুজয়ের মুখে। সে বলল,"আপনি কাণ্ডগুলো ঘটালেন কীভাবে?"

প্রফেসর উল্‌ফ বললেন, "গাড়িটা আসলে দূর নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। রিমোটে চালাচ্ছিলাম। আমার ঘরে স্ক্রিন আছে। ড্রাইভার ছিল না ওতে। ড্রাইভার আর তোমার মাঝে কাচের পর্দাটা আসলে থ্রিডি স্ক্রিন। গাড়ির জানালার কাচগুলো ক্ষেত্র বিশেষে ওই কাজ করেছে। পর্দায় ছবি ফুটে উঠেছে। ড্রাইভারের কথাগুলো আমি ঘরে বসে বলছিলাম। কবরখানার কঙ্কালগুলো আসলে সাজানো ইলেকট্রিক পুতুল। যেমন হরর হাউসে সাজানো থাকে।"

"কিন্তু ওই নেকড়েগুলো তো পুতুল নয়।"

"ওগুলো আমার ট্রেইনড ওয়াচ ডগ। গায়ে ফসফরাস মাখিয়েছি বলে অন্ধকারে ওরা জ্বলছিল। একা এত বড় বাড়িতে থাকি তো, ওদের ভূতুড়ে কুকুর ভেবে চোরডাকাত এ বাড়ির কাছে ঘেঁষে না।"

"কিন্তু আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এতসব আয়োজন কেন?" শেষ প্রশ্ন করল সুজয়।

সুজয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে প্রফেসর উল্‌ফ বললেন, "ভবিষ্যতে যে নিউরো সার্জেন হতে যাচ্ছে তার নিজের নার্ভ কতটা শক্ত তা পরখ করতে হবে তো? নইলে অপারেশন টেবিলে কোনো দুর্ঘটনায় ভয়ংকর ক্ষতবিক্ষত কোনো রোগীকে সে কীভাবে ছিনিয়ে আনবে মৃত্যুর মুখ থেকে? ওইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের নার্ভ কতটা শক্ত তার ওপরেই তো রোগীর জীবন নির্ভর করে।"

এরপর তিনি সুজয়ের পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, "চলো এবার ভেতরে যাওয়া যাক। তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য হাতটা বরফ জলে চুবিয়ে রেখে কনকন করছে। ফায়ারপ্লেসে হাত সেঁকতে হবে। তারপর আজ রাতেই তোমাকে একটা হাতের ডিসেকশন দেখাব। মানুষের হাত। ভয় পাবে না তো?"

তারা দু-জনেই হেসে উঠল তারপর।

BanglaBook.org

র‍্যামেসিস রা-এর রক্তধারা

তাঁবুর কাছেই একটা টিপির ওপর বসে আহার সেরে নিচ্ছিলাম আমি। ভিতরে ভিতরে ভীষণ উত্তেজিত লাগছিল। আমি যেখানে বসে আছি তার কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে এক অনুচ্চ পিরামিড। অনুচ্চ মানে, উচ্চতা আড়াইশো ফুট হবে। তবে কায়রোর অনুবর্তী গিজার গ্রেট পিরামিডের তুলনায় একে শিশুই বলা যায়। ওই পিরামিডের অভ্যন্তরে আজ আমার নৈশ অভিযান। আমি পুরাতত্ত্ব গবেষক হাবার্ট, আমার জীবন-যৌবন যার খোঁজে উৎসর্গ করে আজ বার্ধক্যের সীমানায় এসে উপনীত হয়েছি, অমানুষিক পরিশ্রম করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছি এক ঊষর মরুভূমির দেশে, তা আজ আমার প্রায় করতলগত। —ফারাও দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের বংশধর, র‍্যামেসিস রা-র কবর! ওই পিরামিডের এক গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখা আছে তা। ফারাও র‍্যামেসিসের মতো অতুলনীয় কীর্তি কাহিনী তিনি স্থাপন করে যেতে পারেননি। দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের রাজত্বকাল ছিল আজ থেকে ৩০০০ বছর আগে। মিশরের ইতিহাসে সব থেকে গৌরবজ্জ্বোল অধ্যায় তাঁর রাজত্বকাল। আবু সিম্বলের গ্রেট টেম্পল সহ বহু পুরাকীর্তির জনক তিনি। ফারাও র‍্যামেসিসও তাঁর প্রিয় রাণি নেফারতিতির বহু মূর্ত্তি আজও খোদিত আছে বহু প্রাচীন মন্দির গাত্রে। কিন্তু র‍্যামেসিস রা-র খোঁজ পাওয়া যায় না কোথাও। কোনো উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থাপত্য তৈরি করে যেতে পারেননি এই র‍্যামেসিস রা, মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করেননি নিজের নাম। তাই ইতিহাস তাকে ভুলে গেছে। বহমান নীল নদের স্রোত, আর সদা সঞ্চরণশীল বালির সমুদ্র ঢেকে দিয়েছে র‍্যামেসিস রা-র নামটাকেও। আমি তার সন্ধান পাই আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ফ্রান্সের ল্যুভের মিউজিয়ামের মিশর গ্যালারির এক অতি প্রাচীন পার্চমেন্ট প্যাপিরাস থেকে। আর তারপরই শুরু করি অনুসন্ধান। কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যাবসায় আমাকে পঁচিশ বছর পরে আজ পৌঁছে দিয়েছে অভীষ্ট লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, ওই পিরামিডের এক গোপন কক্ষেই আড়াই হাজার বছর

BanglaBook.org

ধরে ঘুমিয়ে আছেন ফারাও র‍্যামেসিস রা। আপনার হয়তো মনে হতে পারে "রা" তো বিখ্যাত কেউ ছিলেন না, তাহলে এই পিরামিডের এই পদপ্রান্তে পৌঁছতে, এত কৃচ্ছসাধন করলাম কেন আমি? হ্যাঁ, এ কথা আগেই বলেছি যে তিনি মিশরের ইতিহাসে তেমন কোনো নজির স্থাপন করতে পারেননি। হয়তো করার চেষ্টাও করেননি। মাত্র তিন দশক তিনি রাজত্ব করেন এই নীলনদ অববাহিকায়। আর ওই তিন দশকই তিনি ব্যয় করেছিলেন মানবদেহবিদ্যা অধ্যায়নে। দেহবিজ্ঞানে প্রাচীন মিশরীয়রা বহু ধরনের উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন, নশ্বর দেহকে হাজার বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে অবিকৃত রাখার কৌশল তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন তা আমরা জানি। ল্যুভেরের প্যাপিরাসে হিয়ারোগ্লিফিকে বর্ণিত কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে "রা" ওই বিদ্যাতে চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। রক্ত বিষয়ক এমন কিছু তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা নাকি ভবিষ্যতের পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেবে। এ বিষয়ে তিনি এক পুঁথি রচনা করেন, যা তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সারকোফেগাস অর্থাৎ কফিনের পাথুরে আধারের মধ্যেই রাখা হয়। এবার হয়তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে কীসের অন্বেষণে সারাটা জীবন কাটিয়েছি আমি? "রা"র ওই পুঁথি। হয়তো তাক লাগিয়ে দেবে সারা পৃথিবীকে। হ্যাঁ, এমন ব্যাপারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া আছে পার্চমেন্টে। যদিও রক্ত সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের ব্যাপারটা আসলে কী, তা বলা নেই ল্যুভেরের পার্চমেন্ট প্যাপিরাসে।

খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে তাকালাম আমি। অনেক দূর পর্যন্ত সেদিকে দেখা যাচ্ছে। এখন শেষ বিকাল। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। ওই যে দূরে দিগন্তে একটা রেখা চিকচিক করছে, ওটাই নীল নদ। আমি দেখার চেষ্টা করলাম আমার যে দুজন স্থানীয় মিশরীয় সঙ্গীর ফিরে আসার কথা, তারা ফিরে আসছে কিনা? আমার নির্দেশেই ওরা এখানে যেসব কুলির দল ছিল তাদের ছেড়ে আসতে গেছে নীল নদের অনতিদূরবর্তী এক গ্রামে। গতকাল পর্যন্ত ওই কুলির দল এখানেই খননকার্যে লিপ্ত ছিল। ওদের আমি সরিয়ে দিলাম কারণ, সমাধিকক্ষের গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাই আমি। যে দুজন ফিরে আসবে তারাও সঙ্গে না থাকলেই ভালো ছিল। কিন্তু আরও কয়েকটা পাথরের দেওয়াল ভাঙতে হবে। অত প্রাচীন পাথুরে শবাধারটাও খুলতে হবে, যা আমার পক্ষে একা করা সম্ভব নয়, তাই ওদের রাখতে হয়েছে। তবে আমার গোপনীয়তার কারণ এই নয় যে, আমি অবৈধভাবে পিরামিডে প্রবেশ করেছি বা কবর চোরদের মতো কবরের সোনাদানা লুণ্ঠন করতে চাই। সরকারি অনুমতিপত্র আমার আছে, তাছাড়া সরকার এই টেম্পলকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে সরকারিভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে কোনো কবরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমার ভয়ের কারণ হল, স্থানীয় খননকারীদের মধ্যে অনেকে বড় বড় প্রত্ন-অভিযাত্রী দলের হয়ে এজেন্টের কাজ করে। ছোট ছোট অভিযাত্রীদের সঙ্গে ঘোরে তারা।

BanglaBook.org

তারপর দৈবাৎ তেমন কিছু বড় ধরনের আবিষ্কার হলে, তারা সঙ্গে সঙ্গে বড় দলের কাছে সে খবর পৌঁছে দেয়। অর্থবল, লোকবলে বলীয়ান বড় অভিযাত্রীরা এসে কোনো হতভাগ্যের সারা জীবনের কৃতিত্ব, পরিশ্রম আত্মসাৎ করে। এ ঘটনা বহু ঘটে। আমি একা, বলতে গেলে প্রায় নিঃস্ব এই মুহূর্তে। আমি চাই না ওরকম কোনো বড় দল এসে ছিনিয়ে নিক আমার পরিশ্রমের ফল। তাই আমার এই গোপনীয়তা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমি আমার নৈশ অভিযানের সঙ্গীদের উটের পিঠে চেপে ফিরে আসতে দেখলাম। আশ্বস্ত হলাম আমি। এরপর আমি ফিরে তাকালাম পিরামিডের দিকে। অস্তাচলগামী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে পিরামিডের শীর্ষে। অপূর্ব লাগছে! ভাবলাম একটা ছবি তুলে রাখি। ঢিপি থেকে নেমে তাঁবুর দিকে ক্যামেরা আনবার জন্য এগোতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় দেখতে পেলাম একটা লোককে সমাধি মন্দিরে কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে। ঈষৎ ঝুঁকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে যেন সে দাঁড়িয়ে। এখানে লোক এল কোথা থেকে? আমি একটু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। একটু পর যেন আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হল লোকটা। মুখ তুলে দেখল আমাকে। তারপর ধীর পায়ে সামনে ছোট বালিয়াড়িটা অতিক্রম করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনের শতছিন্ন স্থানীয় পোশাক দেখে আমার তাকে ভিখারী গোত্রের লোকই মনে হল। খাদ্যের লোভে এরা যেখানে খননকার্য চলে সেখানে তাঁবুর আশেপাশে ঘুরঘুর করে। এ জাতীয় লোক আমি দেখেছি।

সামনে এসে দাঁড়াবার পর, আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আমার হাতে তখনও ধরা একটা খণ্ড রুটির ওপর। তাতে তার ওপর আমার প্রাথমিক ধারণা বদ্ধমূল হল। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর আমি তাকে বললাম, "এ রুটি তুমি খাবে?" লোকটা আমার কথা শুনে মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, "ও রুটি তুমি এঁটো করেছ?"

লোকটার প্রখর আত্মমর্যাদা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মৃদু হেসে বললাম, "না, এ টুকরো আমি এঁটো করিনি। তুমি নাও।" এই বলে রুটিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

লোকটা কিন্তু হাত বাড়াল না। একটু ইতস্তত করে সে বলল, "রুটির জন্য কী করে দিতে হবে তোমার?" আমি বললাম, "কিছু করতে হবে না। এমনই দিচ্ছি। আরও দিতে পারি, তাঁবুতে আছে।"

আমার কথা শুনে লোকটা ঘাড় নেড়ে বলল, "না, আমি দান গ্রহণ করি না।" চমকে উঠে আমি ভালো করে তাকালাম তার দিকে। লোকটার সুগোল চিবুক, চওড়া কপাল, গায়ের রং, কাঁধের কৌণিক গড়ন, সংকীর্ণ নিতম্ব দেখে আমার অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তের মধ্যে আমাকে জানিয়ে দিল, খাঁটি মিশরীয় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ওর ধমনীতে। চোখদুটো

BanglaBook.org

কেমন গভীর আর উজ্জ্বল। তার ওই প্রশস্ত কপালের আড়ালে যেন লুকিয়ে আছে প্রচন্ড ধীশক্তি। এমন লোক সচরাচর দেখা যায় না। আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, আর সেও আমার দিকে।

কিছুক্ষণ পর উটের পায়ের শব্দ আর কথাবার্তার শব্দে সম্বিত ফিরল আমার। আমার সঙ্গীরা কাছে এসে পড়েছে। পিরামিডে ঢোকার আগে কিছু প্রস্তুতি বাকি আছে। এই লোকটাকে এবার সরাতে হবে। আমি লোকটার হাতটা টেনে রুটিটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম,"যাও এবার।" লোকটা কিন্তু গেল না। রুটি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। এবার আমার একটা অস্বস্তি শুরু হল। ও দাঁড়িয়ে আছে কেন? ঠিক এই সময় আমার উটওলা স্থানীয় লোক দুজন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আর ওই লোকটাকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠল,"ভাগ ভিখারী, ভাগ এখান থেকে! "ভিখারী" কথাটা কানে যেতেই লোকটার চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। আমার সেই সঙ্গীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় চিৎকার করে সে বলল, "আমি ভিখারী নই, ভিখারী তোমরা। যারা অর্থের লোভে সমাধিমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট কর! মৃতদেহের প্রতি অসম্মান কর! ভিখারী তোমরা।"

যে লোকটা তাকে চলে যেতে বলেছিল সে এবার হঠাৎ তার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে উট চালানোর কাঁটাঅলা লাঠিটা ছুড়ে মারল ছিন্ন পোশাক পরা মিশরীয়কে লক্ষ্য করে। ঘটনাটা ঘটল আমি তাকে বাধা দেবার আগেই। সেটা গিয়ে লাগল লোকটার কনুইতে। কাটার খোঁচায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত শুরু হল। লোকটা হাত দিল কনুইতে। তারপর হাতের তালুতে রক্ত নিয়ে মেলে ধরল নিজের চোখের সামনে। রক্তটা দেখে মুহূর্তের জন্য কেমন যেন একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার চোখের কোণে। এরপর সেই অদ্ভুত লোকটা আর দাঁড়াল না। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল পিরামিডের আড়ালে।

লোকটা চলে যাবার পর যে লোকটা লাঠি ছুড়ে ছিল তাকে আমি তিরস্কার করলাম তার এই ব্যবহারের জন্য। তারপর আমি তাদের নিয়ে তাঁবুর দিকে এগোলাম আসন্ন নৈশ্য অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে। অভিযানের উত্তেজনায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ভুলে গেলাম ওই লোকটার কথা।

সূর্য ডুবে গেল। তারপর যখন চাঁদ উঠল তখন গোছগাছ করে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম আমরা। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত সারা উপত্যকা। তার মধ্যে আমাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে পিরামিড, যেখানে ঘুমিয়ে আছেন ফারাও র‍্যামেসিস রা। আড়াই হাজার বছর পর আমিই প্রথম মানুষ যে প্রবেশ করব ঘুমন্ত রাজার কক্ষে। সঙ্গী দুজনকে নিয়ে আমি এগোলাম পিরামিডের দিকে। খানিকক্ষণের মধ্যেই পিরামিডের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করলাম আমরা। ভিতরে ঢোকার পরই মশাল জ্বালিয়ে নিল সঙ্গী দুজন। আমার হাতে ইলেকট্রিক টর্চ।

BanglaBook.org

আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমরা নীচের দিকে নামব? কারণ, পিরামিডের যে অংশ পৃথিবীর দিকে দৃশ্যমান হয় তা নিরেট হয়। আর ভূগর্ভস্থ কক্ষে থাকে সমাধি। এ পিরামিডেও ভূগর্ভস্থ কক্ষ আছে বটে তবে তা লোককে ফাঁকি দেবার জন্য। ওই প্যাপিরাস থেকে আমি জেনেছি, এই ব্যতিক্রমী পিরামিডে সমাধিকক্ষ লুকোনো আছে পিরামিডের উপরিভাগে। যে খবর অন্য কেউ না জানার কারণে ইতিপূর্বে পিরামিডে প্রবেশ করলেও তারা সমাধিকক্ষের সন্ধান পায়নি। সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে তারা অনুসন্ধান করেছিল ভূগর্ভে। নইলে কবে প্রত্নবিদ বা চোরের দল পৌঁছে যেত সমাধি কক্ষে!

পিরামিডের ভিতরে ঢুকে কাজ শুরু করলাম। মাটির প্রায় সমতলে একটা ছদ্ম দেওয়াল আমার নির্দেশে গাঁইতি দিয়ে সঙ্গীরা ভেঙে ফেলতেই তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নিচু ছাদওলা সংকীর্ণ এক সিঁড়ি। মশালের আলোতে মাথা নিচু করে গুঁড়ি মেরে ওপরে উঠতে শুরু করলাম আমরা। ভ্যাপসা বাতাসে শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আড়াই হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোতে সর্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। হাত লেগে যেখানে দেওয়ালে ধুলোস্তর সরে যাচ্ছে, সেখানেই দেওয়ালের গায়ে ফুটে উঠেছে বিচিত্র সব প্রাচীন চিত্র। নানা মিশরীয় দেবতার ছবি। তার কোনোটা বা বাজপাখির মাথা আর মানুষের দেহধারী আকাশদেব হোরাসের ছবি, কোনোটা ভেড়ার মাথাওলা দেবতা হ্যাথোরের, কোনোটা আবার সূর্যদেব "আমন রা-র। সিঁড়ি সোজা ওপরে ওঠেনি। ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে। মাঝে মাঝে অপরিসর সব কক্ষ। তার দেওয়ালও বিচিত্র সব ছবিতে চিত্রিত।

আনুমানিক দেড়শো ফিট ওপরে ওঠার পর একটা পাথুরে দেওয়াল আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। বেশ শক্ত দেওয়াল। সে দেওয়াল ভাঙতে আমাদের ঘন্টাখানেক সময় লাগল। তার ওপাশে এক প্রশস্ত সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গেছে। সেখানে পা রেখেই বুঝতে পারলাম এই সিঁড়ি আমাদের পৌঁছে দেবে আমাদের অভিষ্ট কক্ষের কাছে। সিঁড়ির দু-পাশের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে মৃত ফারাওয়ের শেষযাত্রার ছবি।

সত্যি সেই সিঁড়ি আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে দিল এক চত্বরের মতো জায়গায়। তার এক পাশে একটা দরজা, চত্বর সংলগ্ন কক্ষে প্রবেশের জন্য। আর সেই দরজার সামনে পা ছড়িয়ে বসে দরজা আগলাচ্ছেন প্রাচীন মিশরীয়দের কুকুরদেহী মৃত্যুদেব অনুবিসের পাথুরে মূর্তি। মশালের আলোতে তার চোখ আর থাবার নখ জ্বলজ্বল করছে। কেমন একটা বঙ্কিম হাসি ফুটে আছে তার মুখে। সে হাসি পরিহাস করছে অর্বাচীন আগন্তুকদের। কারুকাজ করা প্রাচীন কাঠের দরজার দু-পাশে পাথুরে দেওয়ালে খোদিত স্বর্গদেব অসিরিসের মূর্তি। যা দেখে আমার বুঝতে অসুবিধা হল না ওই দরজাই হল সমাধিকক্ষের প্রবেশ মুখ। উত্তেজনায় আমার পা তখন কাঁপতে শুরু করেছে।

চৌকাঠের ধুলো সরিয়ে দরজা খুলতেই একটা কাণ্ড ঘটল। ভিতরের কক্ষের একপাশের

BanglaBook.org

পাথুরে দেওয়ালের এক পাশ যেন ঘরঘর শব্দে সরে গেল। আর সেখানে দিয়ে একরাশ চাঁদের আলো এসে প্লাবিত করল সমাধিকক্ষ। আমরা পা রাখলাম ঘরের ভিতর। ঘরে ঠিক মাঝখানে একটা বেদি মতন জায়গাতে রাখা আছে পাথরের তৈরি শবাধার— ফারাও র‍্যামেসিস রা-র সারকোফেগাস, দেওয়ালের গায়ে নানা কুলুঙ্গিতে মমির অন্তঃযন্ত্র রাখার ফুলদানি আকৃতির সোনার পাত্র, ফারাওয়ের ব্যবহৃত বহুমূল্য সব জিনিস। চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে সেসব। প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল সবার। তারপরই আমি সঙ্গীদের নির্দেশ দিলাম সারকোফেগাসটা খুলে ফেলার জন্য। তারা গাঁইতির চ্যাঁড় দিয়ে শবাধারটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। আর আমি উন্মুক্ত দেওয়ালের কাছে দিয়ে তাকালাম বাইরের দিকে। চাঁদের আলোতে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম এখন আমরা পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করছি। আড়াই হাজার বছর পর চাঁদের আলো, মুক্ত বাতাস প্রবেশ করেছে এই কক্ষে। ভাবতেই আমার কেমন অদ্ভুত লাগল! আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম চাঁদের দিকে।

হঠাৎ বেশ শব্দ করে শবাধারে আচ্ছাদন মেঝেতে খসে পড়ল। যারা কাজ করছিল তারা ঝুঁকে পড়ল শবদাহের ভিতরে। আমিও এগোলাম সেদিকে। কিন্তু তার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই আমার সঙ্গী দুজনের একজন চিৎকার করে অপরজনকে বলল, "এ রাজার ঐশ্বর্য আমরাই নেব। শেষ করে দে সাহেবটাকে।" মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম কী হতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের একটা দেওয়ালের কাছে প্রাণ বাঁচাবার জন্য সরে এলাম আমি। আর আমার সঙ্গী দুজন গাঁইতি হাতে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। অসহায় ভাবে আমি তাকিয়ে রইলাম তাদের দিকে। ক্রমশই এগিয়ে আসছে তারা! তারা তখন আমার প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল এক মূর্তি। তাকে দেখে গাঁইতি হাতে লোক দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেই লোকটার মুখে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি চিনতে পারলাম তাকে। বিকেলে রুটির জন্য আসা সেই মিশরীয়! ও এই কবরের খোঁজ পেল কীভাবে?"

লোকটা এগিয়ে আসতে লাগল গাঁইতি ধরা লোক দুজনার দিকে। হঠাৎই এরপর আমার সঙ্গী দুজনের গলা দিয়ে বেড়িয়ে এল ভয়ার্ত চিৎকার। গাঁইতি ফেলে লোকটাকে দেখে পালাবার জন্য ছুটল উন্মুক্ত দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের বাইরে যে মহাশূন্যতা খেয়াল রইল না তাদের। প্রাণভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে লাফ দিতেই অতল গহ্বর গ্রাস করে নিল তাদের। আড়াইশো ফুট নীচে পাথুরে মাটিতে তাদের আছড়ে পড়ার ক্ষীণ শব্দ কানে এল আমার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

আমার সঙ্গী দুজনের অন্তর্ধানের পর লোকটা ফিরে তাকাল আমার দিকে, তারপর

BanglaBook.org

আমার উদ্দেশে শান্ত কণ্ঠে বলল, "তুমি চলে যাও এখান থেকে। সম্পদ লুণ্ঠন করে কবর অপবিত্র কোরো না। শান্তিতে ঘুমাতে দাও ফারাওকে।"

আকস্মিক মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পাবার বিহ্বলতা কাটিয়ে আমি ত্রাণকর্তার জবাবে বললাম, "আমি কবর লুণ্ঠন করতে আসিনি। এসেছি ফারাওয়ের পুথির খোঁজে। আমি জানতে চাই তাতে এমন কী লেখা আছে যা হাজার বছর পরও মানুষকে বিস্মিত করবে। ওই পুথিটাই শুধু প্রয়োজন। যা রাখা আছে ওই শবাধারে।"

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর মিশরীয় আমার কথা শুনে বলল, "হ্যাঁ, ওটা ওখানেই আছে। ওটা তুমি পাবে না। তবে তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে। তোমার রুটির দাম মিটিয়ে দেব আমি।" এই বলে সে উন্মুক্ত কফিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমাকে ইশারাতে কাছে ডাকল। কম্পিত পায়ে আমি এগিয়ে গেলাম সেখানে, তারপর লোকটার আঙুলের নির্দেশে উকি দিলাম সারকোফেগাসের ভিতর। স্বর্ণভূষণে সজ্জিত ফারাও র‍্যামেসিস রা শুয়ে আছেন দারুকাঠের কফিনে। তার বুকের ওপর রাখা আছে অমূল্য সেই পুথি। ফারাও তার হাত দুটো দিয়ে পুথিটা চেপে ধরে রেখেছেন। আর এরপরই ফারাওয়ের মুখ বসানো সোনার মুখোশ দেখে চমকে উঠলাম আমি। আমি জানি ওই মুখোশ জীবিত ফারাওয়ের মুখের হুবহু প্রতিলিপি হয়। আর ওই মুখের আর এক মালিক জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে! হুবহু এক মানুষ! আমার সঙ্গীরা কেন বাইরে ঝাঁপ দিল তা বুঝতে পারলাম আমি। চমকে উঠে আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিকে বললাম, "তুমি কে?"

মিশরীয় জবাব দিল, "ভয় পেয়ো না, আমি মানুষ। র‍্যামেসিস রা-র বংশধর।" আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

লোকটা এবার আমাকে বলল, "পুথিতে কী লেখা আছে তা নিশ্চয়ই এখন অনুমান করতে পারছ তুমি? এবার তাহলে কক্ষ ত্যাগ করো।"

আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, "পুথি পাঠ না করে আমি কী করে বুঝলাম ওতে কী লেখা আছে?" কিন্তু তার আগেই আমার চিন্তাশক্তি ঝিলিক দিয়ে উঠল! হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারলাম ওতে কী লেখা আছে। লেখা আছে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার এমন এক কৌশল, যাতে কয়েক হাজার পরও বংশধরদের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যায় নিজের প্রতিলিপি! হুবহু একরকম! যার প্রমাণ আমার সামনে বিদ্যমান। আমি আর কথা বললাম না। কফিনে শায়িত প্রজ্ঞবান ফারাওয়ের প্রতি নীরবে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পিছনে ঘরের ভিতরে একটা শব্দ হল, বুঝতে পারলাম দেওয়ালের ফাটলটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল দরজাও।

পরদিন সকালে আমি তখন আমার নৈশ অভিযানের সহচরদের কবর দিয়ে উটের

BanglaBook.org

পিঠে মালপত্র বাঁধছি, কিছুক্ষণ আগেই একটা বড় দল এখানে এসেছে সিনেমার শুটিং করার জন্য, অনেক লোকজন তখন পিরামিডের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফারাওদের পোশাকে সেজে, হঠাৎ কানে এল আমার কাছাকাছি একজন লোক তার সঙ্গীকে বলল, "ওই ঢিপির ওপর যে ভিখারিটা বসে আছে তাকে খাবার দিতে গেলাম নিল না! ও বলে কিনা ও রাজার বংশধর। দান নেয় না!" কথাগুলো শুনে তার সঙ্গী বলল, "লোকটা নির্ঘাত পাগল হবে!"

কথাগুলো কানে যেতেই আমি চমকে তাকালাম ঢিপির দিকে। ঢিপির ওপর বসে সেই মিশরীয় তাকিয়ে আছে আমার দিকে। লোক দুজনের কথাগুলো মনে হয় তার কাছেও পৌঁছেছে। একটা চাপা হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটের কোণে। মাথা ঝুঁকিয়ে সে আমার উদ্দেশে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। আমি প্রত্যুত্তরে মাথা ঝুঁকিয়ে উঠে বসলাম উটের পিঠে। র‍্যামেসিস রা-র পিরামিড তখন প্রভাতী সূর্যকিরণে ঝলমল করছে।

BanglaBook.org

রেডিয়োর বন্ধু

সোহমকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, "তুমি তাহলে এ ঘরে বসে পড়াশোনা করো, আমি নীচের ঘরে অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বসি। কলকাতায় ফিরেই কিন্তু তোমার টার্মিনাল পরীক্ষা। দিনেই তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। রাতে তো কোনো কাজ নেই, তুমি পড়বে।"

সোহম মুখে বলল, "আচ্ছা।" আর মনে মনে বলল, "এখানে এসেও দেখছি রেহাই নেই আমার।"

বাবা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। বইপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল সোহম। কাঠের ঘর। সামনে অনেকটা কাচ দিয়ে ঘেরা। একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ঘরে। কিছু টেবিল-চেয়ার ,কাঠের অন্য আসবাবও রয়েছে। তবে দেখে বোঝা যায় সেসব বেশ পুরোনো ধরনের। একটা টেবিলে বই-খাতা রেখে সোহম এগিয়ে গেল কাচের দেওয়ালের সামনে। বাইরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ঢেউগুলো ঝিকমিক করছে চাঁদের আলোতে। আর আকাশটাও অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। মেঘমুক্ত আকাশে যেন লক্ষ কোটি হিরের প্রদীপ কেউ জ্বালিয়ে রেখেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে খুব ভালো লাগল সোহমের। তাদের কলকাতার বাড়ি থেকে আকাশ দেখা যায় না। উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি আকাশকে যেখানে ঢেকে রেখেছে।

আজই সোহমরা এ বাড়িতে এসেছে। শুধু বাড়ি নয়, এ দেশে, এ শহরেও। আজই এসেছে তারা। ইন্ডিয়া থেকে অনেক দূরের দেশ। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। সোহমের বাবা একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি করেন। বেশ একটু উঁচু পদেই চাকরি করেন তিনি। নানা দেশে ওই কোম্পানির শাখা আছে। তারাই কী একটা কাজে এদেশে বাবাকে দিন সাতেকের জন্য পাঠিয়েছে। বাবা সঙ্গে করে এনেছেন সোহমকে। মারও অবশ্য আসার কথা ছিল। কিন্তু তার অফিসে জরুরি কাজ পড়ে যাওয়াতে আসা হল না। এজন্য সোহমের মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে মনখারাপও লাগছে। সোহমকে এ দেশে আনার পেছনে একটা কারণ আছে। সোহমের ডান পা ছোট থেকে বেশ দুর্বল। বাইরে থেকে দেখলে কোনো অসংগতি বোঝা যায় না। কিন্তু ও পায়ে কোনো জোর পায় না সে। ক্রাচ নিয়ে তাকে চলতে হয়। সোহমের বাবা-মা কলকাতায় অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন। আরও খারাপ না হলেও পা-টা ভালো হচ্ছে না। এ দেশটা তো ইউরোপে। সোহমের বাবার ইচ্ছা, এ দেশের কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজ পেলে তাকে একবার সোহমের পা-টা দেখাবেন।

যে বাড়িতে সোহমরা এসে উঠেছে সেটা সোহমের বেশ পছন্দ হয়েছে। কোপেনহেগেন শহরের একটু বাইরে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের দোতলা বাড়িটা। আশেপাশে অন্য কোনো বাড়ি নেই। এ বাড়িতেও একজন কেয়ারটেকার ছাড়া আর কেউ থাকে না। সোহমের বাবার কোম্পানির একজন লোক তাদের এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে এ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে । বাবা বলেছেন এ সমুদ্রের নাম বাল্টিক সাগর। আর তার ওপাশের দেশটাই হল সুইডেন।

কিছুক্ষণ আকাশ দেখার পর সোহমের খেয়াল হল, বাবা বলেছেন তাকে এবার পড়তে বসতে হবে। সামনেই পরীক্ষা। এমনিতে সোহম পড়াশোনাতে খারাপ নয়, কিন্তু ইদানীং যেন তার পড়তে আর ভালোলাগে না। সোহম পড়ার টেবিলের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাচের দেওয়ালের এক কোনোয় অন্য একটা টেবিলে চোখ গেল তার। একটা রেডিয়ো মত যন্ত্র আর একটা ছবি রাখা আছে সেখানে। সে গিয়ে দাঁড়াল সেই টেবিলের সামনে। ছবিতে তিনজন মানুষ। সোহমের বয়সি একটা ছেলে আর তার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা। সম্ভবত তাঁরা ছেলেটার বাবা-মা হবেন। ছেলেটার কানে হেডফোন, মুখের সামনে ধরা একটা মাইক্রোফোন মতো কিছু। ছবির নীচে লেখা, 'হ্যাম ফ্যামিলি।' বেশ হাসিমুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। মৃদু ধুলোর আস্তরণ ছবির গায়ে। সোহম রুমাল দিয়ে ধুলো মুছে ফেলতেই বুঝতে পারল, আরে! ঠিক এই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েইতো তোলা হয়েছিল ছবিটা! এই তো টেবিলের ওপর বসানো যন্ত্রটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে!

'হ্যাম ফ্যামিলি'। কথাটার অর্থ কী? একটু ভাবতেই সোহমের হঠাৎ মনে পড়ে গেল—'এইচ-এ-এম, হ্যাম শব্দের অর্থ শুকরের মাংস হলেও এর আরও একটা অর্থ আছে। কিছু কিছু মানুষ শখের রেডিয়ো স্টেশন খোলেন। তাদের বলা হয়, 'হ্যাম বা হ্যাম অপারেটর।' ওই রেডিয়োর মাধ্যমে তারা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নানা দেশের খবরাখবর আদানপ্রদান করেন। বিভিন্ন অচেনা মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় এর মাধ্যমে। ইন্ডিয়াতে ব্যাপারটা খুব বেশি প্রচলিত না হলেও বিদেশে ব্যাপারটা অনেক দেশে বেশ জনপ্রিয়। বাবার কথাটা মনে পড়লেই 'হ্যাম ফ্যামিলি' কথার অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ছবির পরিবার শখের রেডিয়ো অপারেটর।

BanglaBook.org

এবপরই সোহমের দৃষ্টি গেল রেডিয়োটার দিকে। তার গায়েই রাখা আছে সেই হেডফোন আর মাউথপিস। তবে সবেতেই ধুলো জমেছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে যন্ত্রটা। এটা কি এখনও চলে? বেশ একটা কৌতূহল জাগল সোহমের মনে। ব্যাপারটা একবার দেখাই যাক না? যদি কোনো বন্ধুর খোঁজ মেলে। বাবা এতক্ষণে নিশ্চয় কাজে ডুবে গেছেন। ওপরে মনে হয় চট করে আসবেন না।

সোহম ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। একটা চেয়ার সেই টেবিলের সামনে এনে ক্রাচটা টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে রেডিয়োর সামনে বসল। নানান রকম নব আছে রেডিয়োর গায়ে। হেডফোনটা কানে দিয়ে সোহম একটার পর একটা নব ঘোরাতে লাগল। আর কী আশ্চর্য! হঠাৎই রেডিয়োর গায়ে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। আর তারপরই জ্-জ্-জ্ শব্দ করে যন্ত্রটা চালু হয়ে গেল! সোহম উৎসাহিত হয়ে নব ঘোরাতে লাগল। তার সঙ্গে ঘুরতে লাগল রেডিয়োর গায়ে বসানো কাচের পর্দার আড়ালে ফ্রিকোয়েন্সির কাঁটা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কোথা থেকে যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল সোহমের কানে —"থ্রি টু নাইন টু-হ্যাম অপারেটর বলছি। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?" সোহম তাড়াতাড়ি মাউথপিসটা তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

জবাব এল, 'নরওয়ের রাজধানী, অসলো থেকে।'

নরওয়ে! সোহম প্রশ্ন করল,"আপনাদের ওখানে এখন দিন না রাত?' ওপাশের লোকটা বলল, 'ঘড়ির হিসাবে রাত। তবে এখন তো জুন মাস। আপনি তো বিজ্ঞানী, তাই আপনি জানেন যে, আমাদের দেশে মে থেকে জুলাই সূর্য অস্ত যায় না, ঠিক যেমন নভেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত সূর্য ওঠে না। নিশীথ সূর্যের দেশ। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আগামী তিনদিনের মধ্যে কি স্ক্যান্ডেনেভীয় পর্বতে তুষার ঝড় হবে?'

সোহম বলল, 'তা তো আমি বলতে পারব না। আমি, সোহম। বাবার সঙ্গে কোপেনহেগেন বেড়াতে এসেছি।' ওপাশের কণ্ঠস্বরটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মাপ করবেন, আমি ভেবেছিলাম আমি নরওয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী হ্যামসের সঙ্গে কথা বলছি। ওয়েরলেংসের কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।'

লাইনটা এরপর কেটে গেল। লাইনটা কেটে গেলেও বেশ উৎসাহিত হয়ে ওয়েভলেথ ফ্রিকোয়েন্সির নবগুলো ঘুরিয়ে চলল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও একজনকে পেয়ে গেল। সোহম জানতে চাইল, সে কোথা থেকে বলছে? সে লোকটা জবাব দিল, 'আমি নুবিয়ান অঞ্চল অর্থাৎ সুদান, আফ্রিকা থেকে বলছি। আপনি কোথা থেকে?' সোহম বলল, 'ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন, মানে ইউরোপ থেকে। তা আপনি কি ওখানে তুষার ঝড় হবে কিনা তা জানতে চাইছেন?' না ভেবেই সোহম এ প্রশ্নটা করল।

BanglaBook.org

উত্তরদাতা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুষারঝড়! আমি মরুভূমিতে তাঁবুর মধ্যে বসে আছি। বাইরে উত্তাপ পঞ্চাশ ডিগ্রির বেশি! মরুঝড় হয় এখানে। একফোঁটা জল পাওয়া যায় না এখানে। আবার তুষারঝড়!! তা আপনি করেন কী? চাকরি না ব্যবসা? আপনি কি আমার হ্যাম ফ্রেন্ড হবেন?'

সোহমের তেমন কোনো বন্ধু নেই। তাই সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, হব। আমার নাম সোহম। ক্লাস সেভেনে পড়ি।' সে আরও কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা শুনে বলল, 'ও ক্লাস সেভেন! তাই আবোল তাবোল প্রশ্ন! আমি এত ছোটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি না।' লোকটা চলে গেল অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে।

সোহম মনে মনে একটু আহত হলেও অন্য কাউকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। জনা চারেককে সে এরপর পেয়েও গেল। একজন আমেরিকান, সে বেসবল খেলা সম্বন্ধে খবর নেওয়ার চেষ্টা করল। আর একজন ফরাসি, কী একটা গাড়ির ব্যাপারে ডেমো দিচ্ছিল। আর অন্য দুজনের ভাষা ইংরাজি না হওয়ায় বুঝতে পারল না সোহম। বন্ধু হওয়ার মতো কাউকে পেল না সে। তাকে কেউ আমল দিল না।

রেডিয়োর ব্যাপারটায় একটা নতুনত্ব থাকলেও কাউকে বন্ধুত্ব করতে না পেরে হেডফোনটা খুলতে যাচ্ছিল সে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, বাবা এবার উঠে আসতে পারেন। হঠাৎ সেই মুহূর্তে ভেসে এল নতুন একটা কণ্ঠস্বর। কিছুটা অস্পষ্ট। যেন অনেক দূর থেকে আসছে—'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ...?'

সোহম বলল, 'পাচ্ছি। আপনি পাচ্ছেন?'

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর শোনা গেল, 'হ্যাঁ, এবার পাচ্ছি। আপনি কে বলছেন?' তার কণ্ঠস্বরও এবার স্পষ্ট শোনা গেল। সোহম বলল, 'আমি সোহম। ক্লাস সেভেনে পড়ি। ইন্ডিয়া থেকে কোপেনহেগেন এসেছি ক-দিনের জন্য।' এরপর সে একটু আহতভাবে বলল, 'আমি স্ক্যান্ডেনেভিয়ার ঝড়ের ব্যাপার জানি না। বেসবল খেলা বা কোনো গাড়ির ব্যাপারে খোঁজও রাখি না। ভেবে দেখো, তা সত্ত্বেও তুমি আমার বন্ধু হবে কিনা?'

ওপাশের কণ্ঠস্বরটা যেন একটু হাসল। তারপর বলল, 'আমিও তো তোমারই মতো একটা ছেলে। আমি নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু হব।'

'হবে?' উৎসাহের সঙ্গে বলল সোহম। তারপর বলল, 'যেন, তেমন কোনো বন্ধু নেই আমার। মা-বাবা তো রাতের আগে বাড়ি ফেরেন না। কাজে ব্যস্ত থাকেন। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে চুপচাপ বসে থাকি। পড়াশোনাতেও মন বসছে না আর। স্কুল আর বাড়িতে খালি চুপচাপ বসে থাকি।'

সে বলল, 'কেন, তুমি বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে বা বিকালে খেলাধুলা বা গল্প কর না?'

সোহম বলল, 'বললাম তো আমার তেমন কোনো বন্ধু নেই। আসলে আমার ডান

BanglaBook.org

পায়ে জোর নেই। ক্রাচ নিয়ে চলতে হয়। বন্ধুরা তাই খেলায় নেয় না। উলটে কেউ কেউ খ্যাপায় আমাকে।'

সে বলল, 'ও, এবার বুঝলাম। ওসব নিয়ে মন খারাপ কোরো না। হেলেন কেলার, স্টিফেন হকিং, কত বড় বড় মানুষ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কত কাজ করেছেন, করে চলেছেন যা তাগড়া জোয়ানরাও করতে পারে না। এসো আমরা কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।'

'কী নিয়ে করব?'

'যে কোনো বিষয় নিয়ে। তুমি সামনে যা দেখছ তাই নিয়েও আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।' সেই ছেলেটা বলল।

সোহম বলল, 'আমার সামনে কাচের জানলা। বাইরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র আর আকাশ। অনেক তারা আকাশের গায়ে ঝিকমিক করছে। খুব সুন্দর লাগছে!'

ছেলেটা বলল, 'আমিও ওই একই জিনিস দেখছি। অনেক অনেক তারা চারপাশে। কী উজ্জ্বল সব আলো। যেন মুঠো মুঠো মানিক আকাশের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ!'

সোহম শুনে বলল, 'ও তুমিও বুঝি ঘরে বসে আকাশ দেখছ?'

সে তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'আকাশ বড় অদ্ভুত, তাই না? কত গ্রহ, নক্ষত্রমালা ছড়িয়ে আছে এই মহাকাশের বুকে। শুধু পৃথিবীর ছায়াপথে স্থির তারার সংখ্যা দুশো কোটির বেশি। আর যাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলে তাতে নক্ষত্র সংখ্যা দশ লক্ষ কোটি। ব্যাপারটা ভাবো একবার। এত বড় পৃথিবীটা কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিরিখে বালুকণার মতো। আর গ্রহের সংখ্যা তো সংখ্যাতত্ত্বে ধরা মুশকিল। পৃথিবী থেকে মাত্র ছ-আলোকবর্ষ দূরে বার্নাড তারারই দুটো গ্রহ আছে। প্রায় একশো বছর হতে চলল, ১৯৯৬ সালে পেনসিলভেনিয়ার মানমন্দিরে বসে মার্কিন জ্যোতির্বিদ ইমারসন বার্নাড ওফিউকাস নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে গ্রহ দুটোকে আবিষ্কার করে। আর এখন তো প্রতিদিনই প্রান নতুন গ্রহ আবিষ্কার হচ্ছে।'

সোহম শুনে বলল, 'বাঃ, তুমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপারে অনেক কিছু জান মনে হয়। আমার দৌড় কিন্তু এই ব্যাপারে ভুগোল বইয়ের কালপুরুষ অর্থাৎ ওরিয়ন পর্যন্ত। তবে মহাকাশ যোদ্ধা নিয়ে আমি বেশ কয়েকটা সিনেমা দেখেছি। ভিন গ্রহের প্রাণীরা আক্রমণ করতে আসছে পৃথিবী। আচ্ছা, অন্য গ্রহে কি প্রাণ আছে?'

সে প্রথমে জবাব দিল, 'তা তো থাকতেই পারে। কত অগুনতি গ্রহ!' এরপর সে যেন একটু উষ্মা প্রকাশ করে বলল, 'কিন্তু তারা পৃথিবী আক্রমণ করতে যাবে কেন? পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। তবু যুদ্ধের ব্যাপারটা মনে হয় মানুষের মন থেকে গেল না। তারা এখন মহাকাশ যুদ্ধের কল্পনা করছে।'

BanglaBook.org

সোহম বলল, 'এমন তো হতে পারে, ভিন গ্রহের জীবরা সত্যিই একদিন পৃথিবী আক্রমণ করল?'

ছেলেটা জবাব দিল, 'কেন, তাদের কি পৃথিবী আক্রমণ করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই?'

সোহম একথার উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হেডফোন ছাপিয়ে দরজার বাইরে বাবার ডাক শোনা গেল। সে তাড়াতাড়ি নতুন বন্ধুকে বলল, 'বাবা ডাকছেন, তুমি আমার বন্ধু হলে, কাল একই সময়ে যোগাযোগ কোরো।'

ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'করব, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তবে আমার কথা কাউকে তুমি বলো না কিন্তু। আচ্ছা—বলে রেডিয়ো বন্ধ করে দিল সোহম।

২

পরদিন সকালবেলা বাবার সঙ্গে তার কোম্পানির অফিসে গেল সোহম। সেখানে বাবার কাজ মিটতে ঘন্টা তিনেক লাগল। সেই অফিসেরই একজন সোহমের ব্যাপারে কোপেনহেগেনের এক বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে একদিন পর অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে বাবা তাকে শহর দেখাতে বেরোলেন। কিন্তু সারাদিনই সোহমের মনে হতে লাগল সেই রেডিয়ো ঘরের কথা। একদম রাতের খাওয়া সেরে সন্ধ্যার পর তারা বাড়ি ফিরল। বাবার রেডিয়োর ব্যাপারটা জানা নেই। বাড়ি ফিরেই বইপত্র নিয়ে দোতলার ঘরে দরজা দিল সোহম। ইস, মনে হয় দেরি হয়ে গেল!

রেডিয়ো চালু করে সোহম বলল, 'সোহম কলিং, সোহম কলিং। নতুন বন্ধু শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। তোমার জন্যই তো আমি প্রতীক্ষা করছিলাম।' সেই ছেলেটার কথা শোনা গেল।'

সোহম বলল, 'খুব ভয় লাগছিল। ভাবছিলাম তোমাকে যদি আর ধরতে না পারি! তা কাল কিন্তু তোমার নাম, ঠিকানা কিছুই জানা হয়নি। কোথায় থাক তুমি?'

সে একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিল, 'আমার নাম হান্স। তবে যে জায়গাতে থাকি সে জায়গা তুমি ঠিক চিনবে না। আমার বন্ধুর বাড়ি সেখানে। আমি তার সঙ্গে থাকি।'

'আর তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন?'

হান্স জবাব দিল, 'তারা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। তখন সারা দেশ জুড়ে খুব যুদ্ধ চলছিল, তাতেই মারা যান। আমি খুব একা হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হল। সে আমাকে নিয়ে এল তার সঙ্গে।'

সোহম বলল, 'তোমার বন্ধু খুব ভালো তো! কীভাবে পরিচয় হল তার সঙ্গে?'

BanglaBook.org

সে জবাব দিল, 'ঠিক যেভাবে আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল সেভাবে। হ্যামের মাধ্যমে। সে আমার সঙ্গেই আছে। আমি তাকে বলেছি তোমার কথা।'

'সে সঙ্গেই আছে! তাহলে তাকে দাও, তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা সেরে ফেলি।' বেশ ব্যাগ্রভাবে সোহম বলল।

হান্স জবাব দিল, 'সে ব্যাপারে এখন একটু অসুবিধা আছে।'

সোহম অনুযোগের সুরে বলল, 'তোমার খালি অসুবিধা। কোথাও থাক সেটাও বললে না, বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাতে চাইছ না! আমি কি তোমার বন্ধুকে কেড়ে নেব ভাবছ!'

হান্স যেন একটু হাসল। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। হয়তো সমস্যাটা পরে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, তুমি এখন যে বাড়িতে আছ সেখানে আর কে আছে?'

সোহম জবাব দিল, 'আমি, বাবা আর একজন লোক। সে লোক অবশ্য রাতে চলে যায়।'

'যাক, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

'কীসের নিশ্চিন্ত?' সোহম জানতে চাইল।

কথার জবাব না দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'তোমার ওই ঘরে কি হ্যাম ফ্যামিলির একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ আছে?'

সোহম বেশ অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু এই ছবির কথা তুমি জানলে কী করে।'

সে শুধু জবাব দিল 'আমি জানি।' তারপর যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বলল, 'কাল যেন কী বলছিলে পড়তে তোমার মন বসে না?'

সোহম উত্তর দিল, 'বুঝতে পারছি, আমার কথার উত্তর দিতে তোমার ভালো লাগছে না। হয়তো তুমি আমার বন্ধু নও। আর এজন্যই তো পড়তে ভালো লাগে না। আমার কোনো বন্ধু নেই। এই যেটুকু ক-দিনের কথা তোমার সঙ্গে। দেখা পর্যন্ত হবে না। আমরা ক-দিনের মধ্যেই ফিরে যাব। আরও মনখারাপ হয়ে যাবে।'

ছেলেটা বলল, 'কিন্তু পড়াশোনা তো করতেই হবে। বই সবচেয়ে বড় বন্ধু। জ্ঞান বাড়ায়। জেন, আমি যেখানে এখন থাকি, সেখানে না গেলে জানতামই না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত কিছু জানার আছে। আমাদের ওখানে সবাই জ্ঞান সঞ্চয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যুদ্ধ নিয়ে নয়। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, তারও আগে তোমাদের আর্যভট্ট যেমন ছিলেন তেমন। এরপর একটু থেমে সে বলল, 'আচ্ছা, আমি যদি তোমার কাছে যাই, তোমার মন ভালো হবে?'

'তুমি সত্যিই আমার কাছে আসবে?' উৎসাহিত হয়ে সোহম বলল।

সে বলল, 'হ্যাঁ, আসব। আমি তো রওনা হয়ে গেছি। তোমার রেডিয়োর ওয়েভ লেংথ

BanglaBook.org

আমাকে বলে দিচ্ছে তুমি এখন কোথায়। তাছাড়া ও জায়গা আমি চিনি। দু'দিনের মধ্যে পৌঁছে যাব।

সোহম তার কথা শুনে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ হান্স চেঁচিয়ে উঠল, 'উল্কা! উল্কা!!'

তারপরই ওপাশে একটা ধাতব শব্দ তুলে সোহমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার। সোহম আর তাকে ধরতে পারল না।

৪

চারদিন কেটে গেছে সোহম অনেক চেষ্টা করেও আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। সে রোজ রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রেডিয়োর সামনে বলে গেছে, 'সোহম কলিং, সোহম কলিং।' কত অজানা জায়গা থেকে অন্যরা সাড়া দিয়েছে, কেউ ডমিনিকার রাজধানী রোজো থেকে, কেউ বা বারকিলা উয়াগাডুগু থেকে। কত বিচিত্র জায়গা সব। কত বিচিত্র নাম। কিন্তু সোহমের বন্ধুর খবর মেলেনি।

সোহমকে বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলেন। ডাক্তার সোহমকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বলেছেন, তার পায়ের নার্ভ সব শুকিয়ে গেছে। ইঞ্জেকশনটা একটা শেষ চেষ্টা। এক্ষেত্রে সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারবেন না তিনি। আর ওষুধ কাজ করলেও দীর্ঘ সময় লাগবে।

বন্ধুও আর এল না, আর পা-টাও মনে হয় ঠিক হবে না। মনটাও ভীষণ খারাপ সোহমের। পরদিন তারা দেশে ফিরবে। শেষবারের মতো তার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করে নীচের ঘরে বাবার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল সোহম।

মাঝরাতে হঠাৎই কোনো অজানা কারণে ঘুম ভেঙে গেল সোহমের। পাশে বাবা ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভেঙে সোহমের মনে হল, কোনো অজানা তরঙ্গ যেন তার মস্তিষ্কে বার্তা পাঠাচ্ছে। 'ওপরে যাও, ওপরে যাও।' ওই তরঙ্গটাই যেন তাকে উঠিয়ে দিল। ক্রাচ নিয়ে অন্ধকার হাতড়ে দোতলার ঘরে পৌঁছে রেডিয়োর সামনে দাঁড়াল সে। হেডফোন লাগিয়ে রেডিয়োটা চালু করতেই সোহম শুনতে পেল সেই পরিচিত গলা, 'সোহম, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি তোমায়।'

সোহম উল্লসিত হয়ে বলল, 'তুমি কোথায়?'

সে বলল, 'তুমি বাইরে তাকালেই আমাকে দেখতে পাবে।'

তাকাল সোহম। সে দেখতে পেল চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক অস্পষ্ট অবয়ব। সে যেন হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। এরপর তার কানে ভেসে এল— 'আমার হাতে বেশি সময় নেই। কেউ দেখে ফেলার আগেই ফিরতে হবে। তুমি এক কাজ করো। টেবিলে যে ছবিটা রাখা আছে সেটা নিয়ে বাইরে চলে এসো। ওটা আমি নেব।'

BanglaBook.org

সোহম বলল, 'এত রাতে!'

সে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। ভয় বরং আমারই। কাছে কোনো টহলদারি বোট চলে এলেই বিপদ। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, এসো... এসো...।'

তার অহ্বান যেন অনুরণিত হতে লাগল সোহমের কানে। ছবিটা নিয়ে ঘর ছাড়ল সে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্রাচ বগলে হাঁটতে লাগল সে। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল। সোহম এসে দাঁড়াল তার সামনে। তারই বয়সি একটা ছেলে মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের বাতাসে উড়ছে তার সোনালি চুল। উজ্জ্বল চোখে সে দেখছে সোহমকে। সোহম তাকে বলল, 'তুমি এলে তাহলে! কত যোগাযোগের চেষ্টা করেছি কিন্তু তুমি সাড়া দাওনি।'

ছেলেটা বলল, 'আসলে সেদিন একটা উল্কার সঙ্গে আর একটু হলেই ধাক্কা লাগছিল। আমার গতিপথ পালটাতে হল। তাই তো দেরি হল আসতে। তারপর রেডিয়ো সিস্টেম পৃথিবীর স্যাটেলাইটগুলো যদি আমাদের কথোপকথন ধরে ফেলে সেই ভয়ে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।'

সোহম তার কথা ঠিক ধরতে পারল না। সে ছবিটা তার দিকে এগিয়ে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সোহম বুঝতে পারল আসলে ছবির সেই ছেলেটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হান্স ছবিটা নিয়ে ভালো করে দেখল। তারপর বলল, 'আর তো কোনোদিন ফেরা হবে না এখানে। পৃথিবীর শেষ স্মৃতি এটা। আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।' পরে মমতায় সে ছবিটার ওপর হাত বোলালো।

সোহম এবার বলল, 'আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি ওটা তোমারই ছবি। ছবির অন্য দুজন তোমার বাবা-মা। আর বাড়িটাও তোমাদেরই ছিল। চলো, বাড়িতে গিয়ে আমরা গল্প করি।'

হান্স বলল, 'সেটা সম্ভব নয়, কেউ চলে এলে বিপদ হবে। তাছাড়া আমার সঙ্গে বন্ধুও আছে।'

সোহম বলল, 'কোথায় সে?'

হান্স বলল, 'তাকে দেখে তুমি ভয় পাবে না তো? ও কিন্তু খুব ভালো।'

সোহম অবাক হয়ে বলল, 'ভয় পাব কেন? সে কি ভূত নাকি?'

'না সে ভূত না, বলা যেতে পারে, ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর মানুষের চেয়ে চিন্তায়, বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে সে। আমাদের সব কথা, সব চিন্তাতরঙ্গ বুঝতে পারে সে।' এই বলে সে আঙুল তুলে দেখাল সমুদ্রের দিকে। সোহম তাকাল সেদিকে। সে খেয়াল করেনি। সমুদ্রের প্রায় তীর ঘেঁষে জলে ভাসছে ওলটানো পেয়ালার মতো দেখতে

BanglaBook.org

বিরাট এক বস্তু। মৃদু নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার গা থেকে। আর জল থেকে উঠে হেলতে দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে অদ্ভুত এক মূর্তি।

সে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। অবাক হয়ে গেল সোহম। ফুট পাঁচেক উচ্চতা হবে তার। কাঠির মতো হাত পা। কিন্তু বিরাট বড় মাথা। তাতে বসানো আছে বড় বড় সবুজ চোখ। নাক মুখ সবই আছে। তবে বেশ অদ্ভুত ধরনের হালকা গোলাপী আভা ছড়াচ্ছে তার দেহ। সোহমের দিকে তাকিয়ে সে একটা অজানা শব্দ করল— 'বু-বু-মঁ-মঁ...।'

হান্স বলল, 'তুমি ওর ভাষা না বুঝলেও, ও কিন্তু তোমার মনের ভিতরটা পাঠ করে নিয়েছে। ও তোমার পা-টা একবার দেখতে চায়। দেখাও ওকে।'

একটু ইতস্তত করে ক্রাচে ভর করে ধীরে ধীরে সে ডান পা-টা ওঠাল তার দিকে। অদ্ভুত প্রাণীটা কাঠির মতো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল তার পা। সোহমের মুহূর্তের জন্য যেন মনে হল তার শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। একবার ছুঁয়েই হাতটা সরিয়ে নিল সে। তারপর যেন হান্সের উদ্দেশে হাসল।

হান্স বলল, 'আমাদের এবার ফিরতে হবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটবে।'

সোহম বলল, 'ও মা, এরমধ্যেই? কিছু কথাই তো হল না তোমাদের সঙ্গে।'

হান্স বলল, 'আমরা নিরুপায়। অনেক ছায়াপথ পেরিয়ে এক নক্ষত্রপুঞ্জে ফিরে যেতে হবে। পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে সে জায়গা।'

সোহম বলল, 'নক্ষত্রপুঞ্জ! তাহলে কি আর দেখা হবে না আমাদের?'

সে বলল, 'হতেও তো পারে। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। হয়তো তুমি একদিন খুঁজে পাবে সেই অজানা গ্রহ। তারপর স্পেসশিপে পাড়ি দেবে সেই গ্রহে। আমি সেখানে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করব।'

এরপর সে বলল, 'তোমার ক্রাচটা আমাকে দাও। ওটা আমি তোমার স্মৃতি হিসাবে নিয়ে যাব।'

সোহম ক্রাচটা এগিয়ে দিল তার দিকে। সোহমকে বিদায় জানিয়ে তারা দুজনে ধীরে ধীরে নেমে গেল জলে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ভাসমান চাকতিটা মিলিয়ে গেল জলের নীচে। আর তারপরই সোহম হঠাৎ খেয়াল করল ক্রাচ ছাড়া সে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

৫

রাতের প্লেনে জানলার ধারে বাবার পাশে বসে ফিরছিল সোহম। কাগজ দেখছিলেন বাবা। তিনি হঠাৎ বললেন, 'একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে কাগজে। আজ ভোরে নাকি বাল্টিক সাগরে এক অদ্ভুত জলোচ্ছ্বাস দেখতে পায় একটা সুইডিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন। দশতলা বাড়ির মতো একটা জলস্তম্ভ উঠে আসে সমুদ্রের তলা থেকে। আর তারপর

BanglaBook.org

নাকি তার মাথা থেকে অদ্ভুত একটা চাকতি উড়ে যায় আকাশের দিকে।' সোহমের উদ্দেশে কথাগুলো বলে বাবা এরপর নিজের মনেই যেন বললেন, 'হতেও পারে। কত অদ্ভুত ব্যাপারই তো ঘটে! ডাক্তারের ইঞ্জেকশন যে এত দ্রুত পা-টা ভালো করে দেবে তা কি জানতাম!'

সোহম তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। জানলার স্বচ্ছ কাচের বাইরে মেঘমুক্ত আকাশে লক্ষ তারার ঝিকিমিকি। সেদিকে তাকিয়ে সোহম মনে মনে বলল, 'ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে আমাকে। তারপর আমিও পাড়ি দেব ওই তারার দেশে। যেখানে অপেক্ষা করে থাকবে বলেছে আমার বন্ধু।'

BanglaBook.org

হিরোহিতোর গবেষণা

চিঠিটা পেলাম বিকালের ডাকে।

আমি তখন সবেমাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরেছি। খামের কোণে নীল রঙের এমব্লেম আর হোস্টনের ছাপ দেখেই ধারণা করেছিলাম চিঠিটা প্রফেসর হিরোহিতোরই হবে। মনটা সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠল। ছ-মাস তার কোনো খবর পাইনি। স্বেচ্ছানির্বাসনে আছেন তিনি। এমনকী টেলিফোন লাইনও তিনি কেটে দিয়েছেন। পাছে কেউ তাঁর গবেষণার কাজে ব্যাঘাত ঘটায় সে জন্য।

খামটা খুলতেই দেখলাম, আমার অনুমানই সত্যি। আমাকে ছোট্ট একটা চিঠি পাঠিয়েছেন হিরোহিতো। আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলাম চিঠিটা।

'বন্ধুবর, প্রফেসর মজুমদার,

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। কাজের চাপে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। আসলে আমার ভয় ছিল আমি কাজটা শেষ করতে পারব কিনা তা নিয়ে। কিন্তু আপনি জেনে খুশি হবেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি এক অসাধ্যসাধন করেছি। রোবট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমার এই যুগান্তকারী আবিষ্কার হাল আমলের "নেক্সি"কে পিছনে ফেলে চমকে দেবে পৃথিবীকে।

আপনি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছে। গোপনীয়তার কারণে চিঠিতে তার আর উল্লেখ করা সমীচীন বোধ করছি না।

যাই হোক, এবার কাজের কথায় আসি। বিশ্বের কাছে আমার আবিষ্কার তুলে ধরার আগে আমি আপনাকে তা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। এর একটা কারণও আছে। আপনি জানেন আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত। এক দিকে মারণ রোগ, অন্য দিকে গবেষণার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম—এই দুয়ের মিলিত কারণে আমার শরীর ভেঙে পড়েছে। যদি আমার তেমন কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমার অবর্তমানে বিশ্বের কাছে আমার আবিষ্কার উপস্থিত করতে পারবেন আপনি। আমরা দুজনই এশীয়। তাছাড়া আপনি সৎ ব্যক্তি।

BanglaBook.org

আমি জানি, সে ক্ষেত্রে আমার আবিষ্কার আপনি আত্মসাৎ করবেন না। আমার অনুরোধ, এই চিঠি পাওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমার এখানে চলে আসুন।

ধন্যবাদ সহ
প্রফেসর আকিরা হিরোহিতো
বোস্টন।

পুনশ্চ: আমাদের আর এক বন্ধু ডক্টর ম্যাককেও আমি আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার ধারণা তিনি এবার তার মত পরিবর্তনে বাধ্য হবেন। প্রয়োজন বোধ করলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দুজনে একসঙ্গে আসতে পারেন।'

চিঠিটা পাঠ করে মনের মধ্যে একইসঙ্গে আনন্দ ও দুঃখের অনুভূতি হল। প্রফেসর হিরোহিতো দীর্ঘদিন রোবট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সর্বাপেক্ষা কঠিনতম গবেষণায় রত। তা হল, রোবটের মধ্যে মানবিক অনুভূতির সঞ্চার ঘটানো। অথাৎ কোনো ঘটনা দেখে মানুষ যেমন তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কাঁদে—হাসে, ক্রুদ্ধ হয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তেমনই অভিব্যক্তির প্রকাশ রোবটের মধ্যে ঘটানো। রোবট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা জটিল কাজ এটা। রোবটের এই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' বা 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স' নিয়ে কয়েক দশক ধরেই গবেষণা চলছে। সাফল্যও কিছু এসেছে। অতি সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা 'নেক্সি' নামে এক যন্ত্রমানব তৈরি করেছে, যা তার চোখে বসানো দুটো সিসিডি ক্যামেরা দিয়ে পরিবেশ থেকে হাসির উপাদান খুঁজে নিয়ে হাসতে পারে। তাকে নিয়ে ফ্রান্সের 'লাভালে' এক প্রদর্শনীও হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রোবট বিজ্ঞানীরা তাকে দেখে একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে এযাবৎ কালের মধ্যে রোবট বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার হল নেক্সি।

প্রফেসর হিরোহিতোর আবিষ্কার নেক্সিকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে? হ্যাঁ, এমনটাই তো দাবি করেছেন হিরোহিতো! আমি নিজেও একজন প্রযুক্তিবিজ্ঞানী। তাই প্রফেসর হিরোহিতোর সাফল্যের খবর পেয়ে বেশ আনন্দিত ও উত্তেজিত বোধ করলাম। হয়তো এই আবিষ্কার প্রফেসরকে নোবেলও এনে দিতে পারে। আবার তার পাশাপাশি চিঠির শেষ অংশ পড়ে মনটা ভারী হয়ে গেল। প্রচণ্ড মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী, সদা হাস্যময়, মিষ্টভাষী হিরোহিতো সকলের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ব্যক্তি। মারণ রোগ তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে জেনে মনটা একইসঙ্গে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

চিঠিটা পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। যত দ্রুত সম্ভব প্রফেসর হিরোহিতোর আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য যাব। এরপর আমি টেলিফোন করলাম ডক্টর ম্যাককে, সে হিরোহিতোর কোনো আমন্ত্রণ পেয়েছে কিনা তা জানার জন্য। ম্যাকও বোস্টনে থাকে। বোস্টন আর্মি হাসপাতালের স্নায়ুরোগ বিভাগের প্রধান সে। আফ্রিকান

BanglaBook.org

বংশোদ্ভুত। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমি যখন ভারত থেকে, আর হিরোহিতো জাপান থেকে নিজ নিজ কাজে এদেশে আসি, তখন ম্যাক আর আমরা দুজন এই বাল্টিমোরে একই মেসে থাকতাম। বহু দিনের পরিচয় আমাদের তিনজনের। তবে 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সি'র বিষয় নিয়ে একটা বিরোধ আছে প্রফেসর হিরোহিতো আর ডক্টর ম্যাকের মধ্যে। ম্যাক মানতে চায় না যে যন্ত্রের মধ্যে মানবিক গুণ সঞ্চার করা সম্ভব। সে মনে করে রোবটকে মানুষের আকৃতি প্রদান, হাঁটানো, চলানো, কথা বলানো যায় সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে মানবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো? নৈব নৈব চ। আর হিরোহিতোর মত হল মানবদেহও তো একটা যন্ত্র ভিন্ন কিছুই নয়। তাই তার মধ্যে অনুভূতির প্রকাশ ঘটলে যন্ত্রের মধ্যেও তা ঘটানো সম্ভব। অবশ্য তাদের দুজনের মধ্যে এ বিরোধ নিছকই দর্শণগত। ব্যক্তিগত স্তরে তার কোনো ছাপ নেই। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে, সম্মান করে।

ম্যাককে ফোন করতেই আমার উল্লেখিত ধারণা যে ভ্রান্ত নয় তা বুঝতে পারলাম। ম্যাক আমাকে উৎফুল্লভাবে জানাল যে, গত ছ-মাস ধরে তারও প্রফেসর হিরোহিতোর সঙ্গে দেখা না হলেও তার চিঠি সেও পেয়েছে। যদিও সে ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে, হিরোহিতো যদি সত্যি সফল্য লাভ করে থাকেন তবে আমার চেয়ে সে কম সুখী হবে না। ম্যাকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ঠিক হল, একদিন পরেই আমি পৌঁছব ম্যাকের বাড়িতে। তারপর দুজনে একসঙ্গে যাব প্রফেসর হিরোহিতোর বাড়িতে।

২

একদিন বাদে আলোচনা মতো বাল্টিমোর থেকে লং ড্রাইভে বিকাল নাগাদ পৌঁছে গেলাম বোস্টনে ডক্টর ম্যাকের বাড়িতে। প্রাণচঞ্চল বোস্টন শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে ম্যাকের বাড়ি। একসময় আমি প্রায় চলে আসতাম এখানে। এখন কাজের চাপে আর আসা হয় না। বেশ অনেকদিন পর এলাম বোস্টনে। ম্যাকের বাড়িতে ডোর বেল বাজাতেই দরজা খুলে দাঁড়াল ম্যাক আর তার স্ত্রী ন্যান্সি। সেও আমার পূর্বপরিচিতা। দুজনেই আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল।

ম্যাক বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী প্রফেসর হিরোহিতোর চিঠিটা পাবার পর থেকে আমিও বেশ উত্তেজিত বোধ করছিলাম। যখন তুমি আমাকে ফোন করলে, তখন আমি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।' তার কথা শুনে আমি হেসে বললাম, 'প্রফেসরের চিঠি পড়ে আমার যা মনে হচ্ছে তাতে তুমি তার কাছে সম্ভবত হেরেই গেলে।'

ম্যাক জবাব দিল, 'সেটা ওর ওখানে না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না। আমি কিন্তু আমার ধারণাতেই অটল।'

BanglaBook.org

আমি এরপর জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, তুমি আর প্রফেসর তো একই শহরে থাক। এরমধ্যে তোমাদের দুজনের দেখা হয়েছে?'

ম্যাক বলল, 'না, গত ছ-মাসে একদিনের জন্যও দেখা হয়নি। তবে তার বাড়িতে যে ছোকরা চাকরটা ছিল বিল নামের, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা হত আমার। যদিও খুব বেশি সংবাদ তার থেকে আমি প্রফেসরের সম্বন্ধে পাইনি। দিন সাতেক আগে সে একবার বলছিল প্রফেসরের শরীরটা নাকি বিশেষ ভালো নেই। আজ সকালে আবার হঠাৎ দেখা হয়েছিল বিলের সঙ্গে। সে দুঃখ করে বলল, দু-দিন হল হিরোহিতো নাকি চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করেছেন।'

আমি বললাম, 'কেন, বরখাস্ত করলেন কেন? বিল তো বেশ প্রিয়পাত্র ছিল হিরোহিতোর। তার মুখে ওর প্রশংসাও শুনেছি।'

ম্যাক জবাবে বলল, 'তা জানি না, বিল যা বলল তাতে তারও নাকি ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না। রোজকার মতো কাল সকালে সে প্রফেসরের বাড়িতে যেতেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হিরোহিতো নাকি তাকে বলেছেন যে তাকে আর কাজে আসতে হবে না। বেচারাকে বাড়ির ভিতরেও ঢুকতে দেননি তিনি। তার হাতে একটা চেক ধরিয়ে দিয়ে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন।'

আমি শুনে মন্তব্য করলাম, 'প্রফেসর তো খুব হৃদয়বান মানুষ। নিশ্চয় বিলকে বরখাস্ত করার পেছনে কোনো কারণ আছে যেটা বিল চেপে গেছে। হিরোহিতোকে কোনোদিন কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে দেখিনি।'

ম্যাক বলল, 'তা হতে পারে।'

ম্যাক এরপর হিরোহিতোর সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চলে গেল আমাদের পুরোনো দিনের প্রসঙ্গে। যুবা বয়সে আমরা কেমন যখন-তখন লং ড্রাইভে গিয়ে আনন্দ করতাম, আমাদের পুরোনো সঙ্গীরা কে কোথায় কী করছে এসব বিষয়ে অনেক দিন পর স্মৃতি রোমন্থন হতে লাগল। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে খাওয়া হয়নি আমার। ন্যান্সি খাবার নিয়ে এল আমার জন্য। গল্পগুজব, খাওয়া সেরে, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আমরা যখন হিরোহিতোর বাড়ি যাবার জন্য বাইরে এলাম তখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আজ ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখ। এদিকে বেশ ঠাণ্ডাও পড়তে শুরু করেছে। আমাদের যেতে হবে শহরের বাইরে বোস্টন বন্দরের দিকে। অতঃপর আমরা রওনা হয়ে গেলাম গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে।

শহরের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। এক্স-মাস আর নিউইয়ার্স ইভের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বড় বড় হাইরাইজ আর শপিং মলগুলো সেজে উঠেছে আলোকমালায়। একসময় এই আলোকোজ্জ্বল নগরীকে পেছনে ফেলে বন্দরের দিকে এগোতে লাগলাম। তারপর তার কাছাকাছি পৌঁছে সমুদ্রের সমান্তরাল গাছে ঘেরা একটা

BanglaBook.org

নির্জন রাস্তা ধরলাম। এদিকে লোকজন বিশেষ থাকে না। অনেক দূরে দূরে কয়েকটা বাড়ি আছে মাত্র। বোস্টন বন্দরের জাহাজের 'ভোঁ' ছাড়া নগরীর অন্য কোনো কোলাহল এদিকে এসে পৌঁছয় না। নিরিবিলিতে কাজ করার পক্ষে একদম আদর্শ জায়গা বেছেছেন হিরোহিতো। যত তার বাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল। তত বুকের ভিতর কেমন যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম আমি। সেই রাস্তা ধরে মিনিট কুড়ি চলার পর অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম আমরা।

৩

গাড়ি থেকে নামার পরই বুঝতে পারলাম বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। প্রাচীর ঘেরা বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গাছে ঘেরা সাবেকি আমলের বাড়িটা। এ বাড়ি আগে কোনো জাহাজীর ছিল। পরবর্তীকালে হিরোহিতো কিনে নেন। এ বাড়িতে এর আগে আমরা অনেক বার এসেছি। অকৃতদার হিরোহিতো একলাই থাকেন এখানে।

অন্ধকারের মধ্যে কুয়াশার চাদর মুড়ে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বড় বাড়িটা। কোনো আলো জ্বলছে না। ম্যাক বলল, 'কেমন একটা ভূতুড়ে পরিবেশ, তাই না! পাওয়ার কাট? নাকি উনি বাড়িতে নেই?'

কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকে গাছে ঘেরা মোরাম বিছানো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডোর বেল বাজালাম। কয়েক বার সেটা বাজাবার পর ভিতর থেকে সম্ভবত প্রফেসরেরই গলা ভেসে এলো, 'কে —?'

আমি উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'আমি মজুমদার, আর ম্যাক। আমরা এসেছি।'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর দরজার ওপাশে একটা মৃদু খসখস শব্দ পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন প্রফেসর হিরোহিতো। তাঁর হাতে একটা মোমবাতি। একটা লম্বা ঝুলের ওভারকোট তাঁর গায়ে। পায়ে জুতো, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি। কপালের অর্ধেক অংশ তাতে ঢাকা পড়ে আছে। আমি ভেবেছিলাম এতদিন বাদে তার সঙ্গে দেখার হবার পর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু তিনি মোমবাতিটা একটু উঠিয়ে ধরে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন তিনি অপরিচিত কাউকে দেখছেন!

আমি কয়েক মুহূর্ত পর হেসে ফেলে বললাম, 'তা আমরা কি ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব। ভিতরে ঢুকব না?'

মোমের আলোতে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল প্রফেসরের মুখে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ভিতরে আসুন।'

প্রফেসরের পিছন পিছন আমরা গিয়ে বসলাম ড্রয়িংরুমে। ঘরের চারপাশে বইয়ে

BanglaBook.org

ঠাসা আলমারি। দেওয়ালের মাথার দিকে এক জায়গাতে ঝুলছে আমাদের তিনজনের বাঁধানো ফটোগ্রাফ। অনেকদিন আগে আমরা এ ছবিটা তুলেছিলাম। আমার বাড়িতেও একটা কপি আছে। প্রফেসর হিরোহিতো মোমটা আমাদের সামনে টেবিলে নামিয়ে রেখে উলটো দিকের একটা চেয়ারে বসে দেওয়ালে ঝোলানো 'ফোটোগ্রাফটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

ম্যাক চারপাশে একবার তাকিয়ে বলল, 'ইলেকট্রিসিটি নেই দেখছি। কোনো কিছু খারাপ হয়েছে নাকি?' হিরোহিতো কোনো জবাব দিলেন না। একইভাবে চেয়ে রইলেন।

আমি হিরোহিতোকে এরকম নিশ্চুপ দেখে এবার বললাম, 'প্রফেসর, আপনার শরীরটা কি ইদানীং খুব বেশি খারাপ হয়েছে?'

হিরোহিতো সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'এখন ঠিক আছি।' তারপর আমাদের চমকে দিয়ে বললেন, 'তা আপনারা দুজন হঠাৎ আমার কাছে কেন এলেন বলুন তো?'

আমি বললাম, 'আমরা দুজন আপনার চিঠি পেয়ে এখানে এসেছি। আপনার আবিষ্কার দেখব বলে।'

হিরোহিতো আমার কথা শুনে দু-হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে বললেন, 'ও! আসলে শেষ ক-দিন আমার এত পরিশ্রম গেছে যে মাঝে মাঝে কিছুই মনে রাখতে পারছি না।'

ম্যাক বলল, 'আমার মনে হয় আপনার টানা কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। আপনার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে বলে চিঠিতে লিখেছেন।'

হিরোহিতো শুধু ঘাড় নাড়লেন তার কথা শুনে। তারপর চেয়ে রইলেন টেবিলের দিকে।

আমি এরপর আবিষ্কারের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করব ভাবছিলাম কিন্তু ঠিক তখনই এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল যে তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। কথা শুরু করতে যাব আমি, এমন সময় একটা রিনরিন শব্দ শুনে দেখি ঘরের উলটোদিকের একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে হিরোহিতোর আদরের ছোট্ট পাগ জাতীয় কুকুরটা। কোথাও মনে হয় সে এতক্ষণ বাঁধা ছিল। চেন সমেত খুলে চলে এসেছে। মাটির সঙ্গে চেনের ধাতব ঘষটানিতে রিনরিন শব্দ হচ্ছে। ম্যাক নিজে পশুপ্রেমী। তার বাড়িতেও একসময় কুকুর ছিল। পাগটাকে দেখেই সে উৎফুল্লভাবে ডাকল, 'আয়, আয়, এদিকে আয়।'

কুকুরটা কিন্তু কাছে এল না। আমাদের একবার দেখে নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রফেসর হিরোহিতোর দিকে তাকিয়ে গজরাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রফেসর। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'যা, ভাগ বলছি এখান থেকে, ভাগ ভাগ। দু-দিন ধরে তুই জ্বালিয়ে মারছিস আমাকে। যা ভাগ—'

হিরোহিতোর কথা শুনে চলে না গিয়ে চিৎকারের মাত্রা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল

BanglaBook.org

কুকুরটা। আর তার পরক্ষণেই এক অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসলেন প্রফেসর। চেয়ার ছেড়ে ছুটে গিয়ে চেন সমেত কুকুরটাকে তুলে নিয়ে আমরা তাকে বাধা দেবার আগেই দরজার কাছে গিয়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে আছড়ে ছুড়ে ফেললেন কুকুরটাকে। প্রাণীটার করুণ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হল বাইরে অন্ধকারে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাক প্রফেসরের উদ্দেশে বলল, 'এ আপনি কী করলেন প্রফেসর?' প্রফেসর ফিরে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'যা করেছি ঠিক করেছি। আপনি আমার কুকুরের ব্যাপারে বলার কে?' তার কথা শুনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল ম্যাক। সদাহাস্যময়, সহৃদয় প্রফেসরের থেকে এরকম কর্কশ অমানবিক ব্যবহার আমরা আশা করিনি। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। আর হিরোহিতো ম্যাকের কথার জবাব দিয়ে আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এসে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন আমাদের। পুরো ব্যাপারটাতে ধাতস্থ হতে আমাদের বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল। আমি ভাবলাম হিরোহিতো নিশ্চয়ই তার স্বভাববিরুদ্ধভাবে হঠাৎই কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলেছেন। তাই ঘরের পরিবেশটাকে আবার অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমি বললাম, 'তাহলে প্রফেসর, এবার আমরা আপনার সেই আশ্চর্য আবিষ্কার দেখতে পারি কি?'

আমার কথা শুনে প্রফেসর জবাব দিলেন, 'আমি দুঃখিত, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছি আমি। আপনাদের সেটা দেখানো সম্ভব নয়।'

ম্যাক বলে উঠল, 'তার মানে শুধু শুধু আমাদের এখানে ডেকে আনলেন আপনি! অবশ্য আমি এখনও বিশ্বাস করি যে যন্ত্রের মধ্যে পুরোপুরি মানবিক গুণ সঞ্চার করা সম্ভব নয়। খুব বেশি হলে ওই নেক্সির মতো তাকে হাসানো বা কাঁদানো যেতে পারে। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

ম্যাকের কথার শেষ অংশের শেষটা ধরতে পেরে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হিরোহিতো ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এ বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি তর্ক করতে যাব না। আমার এখন কাজ আছে। আপনারা এবার যান।'

হিরোহিতো যেন এই কথাটা বলার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। এরপর আর বসে থাকা যায় না, তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পিছনে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর।

ম্যাক বাইরে চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল, 'আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত ব্যবহার করলেন কেন উনি?' আমিও তখন ম্যাকের মতোই বিস্মিত প্রফেসরের ব্যবহারে। কিছু দূরে মাটিতে নিশ্চুপভাবে পড়েছিল হিরোহিতোর কুকুরটা। ম্যাক তাকে পরীক্ষা করে বলল, 'এখনও কুকুরটার প্রাণ আছে। তবে এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আর ও বাঁচবে না।

BanglaBook.org

এটাকে আমি এখন নিয়ে যাই।' এই বলে সে কোলে তুলে নিল প্রাণীটাকে। আমরা এরপর তাকে নিয়ে এগোলাম কম্পাউন্ডের বাইরে দাঁড়ানো গাড়ির দিকে।

সারা রাস্তা আমরা আলোচনা করলাম প্রফেসর হিরোহিতোর অদ্ভুত আচরণ নিয়ে। কিন্তু তার কারণটা কেউই বুঝতে পারলাম না।

সে রাতটা ম্যাকের বাড়িতেই কাটালাম। পরদিন ভোরে রওনা দিলাম বাল্টিমোরে ফেরার জন্য। ফেরার সময় ন্যান্সিও আমার সঙ্গী হল। বাল্টিমোর পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসে সে চলে গেল ওয়াশিংটনে তার ছেলের কাছে এক্স-মাস, নিউইয়ার্স ইভের ছুটি কাটাতে।

৪

বোস্টন থেকে ফিরে আসার পর চারটে দিন কেটে গেল। এর মধ্যে যে হিরোহিতোর কথা আমার মনে পড়েনি তা নয়, তবে কাজের কিছু চাপ ছিল, বেশি ভাবার সুযোগ পাইনি। পঁচিশে ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠে বোস্টনে ম্যাককে ফোন করলাম বড়দিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর প্রফেসর হিরোহিতোর কোনো সংবাদ আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করতেই ম্যাক বলল, 'না, তার কোনো খবর নেই। আমি ভাবছি তার বাড়িতে আজ বিকেলে একবার যাব। আমার মনে হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে তার স্নায়বিক কোনো সমস্যা হয়েছে, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে ওরকম রুক্ষ ব্যবহার করলেন। স্নায়বিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার ওকে সাহায্য করা প্রয়োজন। তাছাড়া ওর কুকুরটাও সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রফেসর আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। হয়তো তিনি এখন আমাদের প্রতি ব্যবহারে দুঃখিত, কিন্তু লজ্জায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না।'

ম্যাকের কথা শুনে আমি সহমত পোষন করলাম। ম্যাক বলল, প্রফেসর হিরোহিতোর বাড়ি থেকে ফিরে রাতে সবিস্তারে সব কিছু জানাবার জন্য ফোন করবে আমাকে।

সেদিন রাতে ম্যাকের ফোন কিন্তু এল না। গভীর রাত পর্যন্ত তার ফোনের অপেক্ষায় থাকার পর তার সেলফোনে বা ল্যান্ড ফোনে—কোথাও তাকে ধরতে পারলাম না আমি।

পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ ওয়াশিংটন থেকে ফোন এল ন্যান্সির। একটু উদ্বিগ্নভাবে সে আমার কাছে জানতে চাইল ম্যাকের কোনো খবর আমার জানা আছে কী না? গত চব্বিশে ঘন্টায় সে ম্যাককে অনেক বার ফোন করেও পায়নি।

আমি তাকে আগের দিন সকালে টেলিফোনে ম্যাকের সঙ্গে কথপোকথনের কথা বললাম। আমিও যে তাকে ধরতে পারছি না সেটাও জানালাম।

ন্যান্সি ফোন ছেড়ে দেবার পর আমি আবার ম্যাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। তার বাড়ির ফোনটাতে রিং হয়ে গেল, সে ধরল না। আর তার মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ। এরপরই আমার ম্যাকের জন্য কেমন যেন দুশ্চিন্তা শুরু হল। তার কিছু বিপদ হয়নি

BanglaBook.org

তো? আমার হাতে এখন কিছু কাজ নেই। ঠিক করলাম আর একবার বোস্টনে ঘুরে আসি। সেইমতো আমার গাড়ি নিয়ে সেই রাতেই বাড়ি ছাড়লাম আমি।

৫

বোস্টনে পৌঁছে প্রথমেই আমি উপস্থিত হলাম ম্যাকের বাড়ি। দেখলাম তার বাড়ির সদর দরজায় তালা বন্ধ। দরজার সামনে পড়ে আছে দু-দিনের সংবাদপত্র। তার মানে কি দু-দিন বাড়ি ফেরেনি ম্যাক? ওর ল্যান্ড ফোনটা কেউ ধরেনি কেন এবার তা বুঝতে পারলাম। ম্যাকের বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাববার পর আমি আমার পরবর্তী গন্তব্য স্থির করে নিলাম। আমি যাব প্রফেসর হিরোহিতোর বাড়ি। ম্যাক আমাকে জানিয়েছিল সে সেখানে যাবে। আর সেদিন সন্ধ্যা থেকেই সে নিখোঁজ। এমন হতে পারে ম্যাক কোনো কারণে প্রফেসরের বাড়িতেই রয়েছে। হয়তো হিরোহিতোকে কোনো সাহায্য করার জন্যই। অথবা সে অন্য কোথাও গেলে সেকথা প্রফেসরকে জানিয়েও যেতে পারে। যদিও প্রফেসর আমাদের সঙ্গে সেদিন খুব একটা ভালো ব্যবহার করেননি, তবু এসব কথা চিন্তা করে হিরোহিতোর বাড়ির উদ্দেশে এরপর রওনা দিলাম আমি।

নির্জন দুপুর। প্রফেসরের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ল প্রফেসরের বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের একটা ক্যাডিলাক গাড়ি। ও গাড়ি আমি চিনি। তার মানে ম্যাক এখানে এসেছে। উৎসাহিত হয়ে কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে সোজা এগোলাম বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনের দিকে সব দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বার কয়েক কলিং বেল বাজালাম। তারপর দরজায় ঘা দিয়ে প্রফেসরে নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া এল না। হঠাৎ আমার মনে হল, বাড়ির পিছন দিকে যে দিকে —প্রফেসরের ল্যাবরেটরি, সেদিক থেকে মাঝে মাঝে কীসের যেন শব্দ ভেসে আসছে। মনে হল, হয়তো প্রফেসর সেদিকে আছেন বলে আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন না। গাছে ঘেরা বাড়িটাকে বেড় দিয়ে এরপর আমি পা বাড়ালাম বাড়ির পিছনের অংশে যাবার জন্য। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছের তলায় মরে পড়ে আছে প্রফেসরের পাগটা। প্রাণীটার দেহে পচন ধরেছে। গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রাণীটা কেন মরল, বা মৃতদেহটা বা কেন এভাবে ফেলে রাখা হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার পাশ কাটিয়ে এগোলাম বাড়ির পিছন দিকে।

উপস্থিত হলাম বাড়ির পিছন দিকে। সেদিকের দরজাটা হাট করে খোলা। হ্যাঁ, সেই শব্দটা আসছে বাড়ির ভিতর প্রফেসরের ল্যাবরেটরি বা তার সংলগ্ন কোনো ঘর থেকেই। আমি প্রবেশ করলাম বাড়ির ভিতর। তারপর উপস্থিত হলাম প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে।

BanglaBook.org

বিরাট ল্যাবরেটরির চারপাশে অজস্র নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে আছে কিন্তু হিরোহিতো বা ম্যাক সেখানে নেই। এবার আমি বুঝতে পারলাম ল্যাবরেটরি থেকে যে লম্বা বারান্দাটা চলে গেছে বাড়ির সামনের অংশে, সেই বারান্দার দু-পাশের কোনো একটা ঘর থেকে শব্দটা আসছে। ল্যাবরেটরি ছেড়ে আমি পা রাখলাম বারান্দাতে। বারান্দার দু-পাশে সার সার ঘর। কিন্তু সেই শব্দটা কেন জানি না থেমে গেল। আর একটা তীব্র পচা গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। এত পচা গন্ধ যে গা গুলিয়ে আসছে। রুমাল চাপা দিতে হল নাকে। কয়েক পা এগিয়ে বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'প্রফেসর হিরোহিতো, আপনি কোথায়?'

ঠিক সেই সময় আবার শব্দটা হল। বারান্দায় একটা ঘরের ভিতর থেকে কেউ বন্ধ দরজা ধাক্কাচ্ছে! আর তারপরই সেই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকের কণ্ঠস্বর। 'মজুমদার, তুমি! শিগগির দরজা খুলে দাও, শিগগির!'

আমি ম্যাকের কণ্ঠস্বর শুনে সেই ঘরের কাছে ছুটে গিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে দিতেই ম্যাক সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। রক্তাক্ত তার চেহারা। মুখে একটা আতঙ্কের ভাব!

আমি তাকে দেখে বললাম, 'ম্যাক তোমার কী হয়েছে? তোমার এ অবস্থা কেন? প্রফেসর কোথায়?'

আমার প্রশ্নের জবাবে ম্যাক শুধু বলল, 'শয়তানটা এমনভাবে হঠাৎ আমার মাথায় মারল যে রিভলবার বার করারও সময় পাইনি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। দু-দিন ধরে আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছে ও।'

আমি বললাম, 'কার কথা বলছ তুমি?'

ম্যাক কিছুটা ভয়ার্ত কণ্ঠে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, 'সব কথা তোমাকে পরে বলছি। এখানে আর কোনো কথা নয়। বাঁচতে হলে এই মুহূর্তে আমাদের বাড়ির বাইরে যেতে হবে।' এই বলে সে আমার হাত ধরে টেনে এগোলো বাড়ির বাইরে যাবার জন্য। বারান্দা অতিক্রম করে প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। অপর দিকে দরজা দিয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করলেন প্রফেসর হিরোহিতো। তার পরনে আগের দিনের মতোই সারা দেহ ঢাকা পোশাক। শুধু টুপির নীচ থেকে মুখমণ্ডলটা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত বাইরে থেকে এইমাত্র ফিরলেন তিনি।

আমি তাকে দেখে চিৎকার করে উঠলাম, 'প্রফেসর হিরোহিতো!!' আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। কী অন্তর্ভেদী পলকহীন সেই দৃষ্টি! যেন আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলো পর্যন্ত পাঠ করতে চাইছে সেই চোখ। আমি অনুভব করলাম ম্যাকের বাঁ হাত ক্রমশ চেপে বসেছে আমার কবজিতে। আর এরপরই ম্যাক একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। তার জামার তলা থেকে আর্মি

BanglaBook.org

রিভলরবারটা ডান হাতে বার করে তাগ করল হিরোহিতোর দিকে। ভয়ংকর কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে আমি বলে উঠলাম, 'ম্যাক তুমি কি করতে যাচ্ছ? নিজেদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা মিটিয়ে নাও। আর প্রফেসর হিরোহিতো, আপনারই বা কী হয়েছে? আপনি কি ম্যাককে আটকে রেখেছিলেন?'

আমার কথার কেউ কোনো জবাব দিল না। শুধু যেন একটু ক্রুর হাসি ফুটে উঠল হিরোহিতোর ঠোঁটের কোণে। উদ্ধত রিভলবার দেখেও অচঞ্চলভাবে ধীর পদক্ষেপে প্রফেসর এগোতে লাগলেন আমাদের দিকে। ম্যাকের হাত কাঁপছে। চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি শেষ বারের মতো এবার নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম ম্যাককে। কিন্তু সে এক ধাক্কায় আমাকে পাশে ঠেলে দিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে দু-হাতে রিভলবার চেপে চালিয়ে দিল গুলি। রিভলবারের প্রচণ্ড শব্দে আর বারুদের ধোঁয়ায় ভরে গেল ঘর। কিন্তু ম্যাকের প্রথম গুলিটা মনে হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পাতলা ধোঁয়ার আস্তরণের মধ্যে দেখলাম হিরোহিতো মুহূর্তের জন্য একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আবার এগোতে লাগলেন আমাদের দিকে। মাত্র ফুট দশেকের ব্যবধান। তাঁর মুখের হাসিটা যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, আর তারপরই ম্যাক তাকে লক্ষ্য করে পরপর বেশ কয়েকটা গুলি চালিয়ে দিল। গুলিগুলো প্রফেসর হিরোহিতোর শরীরে কোথায় লাগল জানি না। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে পরমুহূর্তেই এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল। প্রফেসর হিরোহিতোর শরীর থেকে বৈদ্যুতিক স্পার্ক নির্গত হতে লাগল চট্ পট্ শব্দে, একটা নীলাভ বৈদ্যুতিক জাল যেন ঘিরে ধরল তাকে। থরথর করে কাঁপতে থাকল প্রফেসর হিরোহিতোর শরীর। আর তারপরেই একটা প্রচণ্ড ধাতব শব্দ তুলে হিরোহিতোর দেহ কোমরের কাছ থেকে বিভক্ত হয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। না কোনো রক্ত তাতে নেই। সামান্য একটু ধূম উদ্‌গীরণ হল মাত্র।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে আমার কিছুটা সময় লাগল। তারপর আমি ম্যাককে বললাম, 'তুমি কি ধরতে পেরেছিলে ব্যাপারটা?'

ম্যাক বলল, 'প্রফেসরের হঠাৎ আচারণ পরিবর্তন, চাকরকে বরখাস্ত করা, আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, বাতি নিভিয়ে রাখা, সবসময় দেহ ঢাকা পোশাক পড়া—এসবে আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি যখন যন্ত্রমানবটা আমার মাথায় আঘাত করে। ওটা ছিল ধাতব আঘাত। এক আঘাতেই মাথা ফেটে জ্ঞান হারাই আমি। তবে কুকুরটা কিন্তু প্রথম থেকেই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছিল। আমরা যেদিন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে আসি সেই প্রথম দিনের মতোই আমি একলা যখন সেদিন এখানে আসি তখন পাগটা ওকে দেখেই গজরাতে শুরু করেছিল। যন্ত্রমানুষটা তাই মেরে ফেলল ওকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাহলে আমাদের হিরোহিতো কোথায় গেলেন?'

BanglaBook.org

ম্যাক বলল, 'চলো, বাড়িটা এবার ভালো করে খুঁজে দেখা যাক।'

একটু খোঁজাখুঁজির পর, বারান্দায় দুর্গন্ধের উৎসটা আবিষ্কার করলাম আমরা। একটা বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে খাটের ওপর গলিত একটা মৃতদেহ দেখতে পেলাম। বিকৃত হলেও সেটা যে প্রফেসর হিরোহিতোর তা বুঝতে অসুবিধা হল না। তার পাশে পড়ে আছে একটা নোট বুক। তুলে নিলাম সেটা। তার শেষ পাতাতে কাঁপা কাঁপা হাতে মাত্র কয়েকটা কথা লেখা। তারিখটা লেখা আছে আঠেরোই ডিসেম্বর। অর্থাৎ আমরা যেদিন হিরোহিতোর বাড়িতে প্রথম এলাম তার দু-দিন আগের ঘটনা।

হিরোহিতো লিখেছেন, 'যন্ত্রের মধ্যে মানবিক গুণ সঞ্চারে আমি সফল হলাম ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটার পরিণতি এত ভয়ংকর হবে ধারণা ছিল না। লোকজনকে চমকে দেবার জন্য ওকে নিজের অবয়বে তৈরি করেছিলাম, সেটাই আমার কাল হল। ওর মধ্যে আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সঞ্চারিত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অজান্তেই ওর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব সৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি। বিজ্ঞানের এ এক অদ্ভুত সাফল্য। কিন্তু আমার অবয়বধারী যন্ত্রমানব এখন চাইছে আমাকে খুন করে আমি হয়ে বেঁচে থাকতে। আমাকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে সে। মজুমদার বা ম্যাকের সঙ্গে আর হয়তো দেখা হল না। ওরা এসে পড়লে হয়তো আমি মুক্তি পেতাম। বর্তমানে এই যন্ত্রমানবের ইচ্ছাশক্তি বা দৈহিক শক্তিকে প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। ওই তো সে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে...! বাইরের বারান্দায় তার স্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমি! সে আসছে! সে আসছে...'

আর কোনো কথা লিখে যেতে পারেননি হিরোহিতো। বোধহয় এরপরই তার জীবনে অন্তিম পরিণতি ঘনিয়ে এসেছিল।

ম্যাক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যিই প্রফেসর হিরোহিতোর কাছে হার মানলাম আমি।' আর তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার বাইরে একটা শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, যন্ত্রমানবের দেহের উর্দ্ধাংশ দু-হাতে ভর দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রমানবের চোখে ফুটে আছে জিঘাংসা!

ম্যাক তার রিভলবারের শেষ গুলিটা চালাল যন্ত্রমানবের মাথা লক্ষ্য করে। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ। তারপরেই যন্ত্রমানবের মাথা থেকে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার চিপ্‌স ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। এবার সত্যি নিথর হয়ে গেল হিরোহিতোর যন্ত্রমানব। তার দিকে তাকিয়ে ম্যাক বলল, 'ওর আর কোনো মানবিক বোধ নেই। তবে আমাদের একটা মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। প্রফেসর হিরোহিতোর মরদেহের অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।'

BanglaBook.org

দেবতার চাবি

তাঁবুর ছায়ায় একলা বসে ছিলাম। বিকাল পাঁচটা হলেও নুবিয়ান মরুভূমিতে রোদের তেজ প্রচণ্ড। বাইরে আগুনের হলকা ছুটছে। দিন তিনেক হল এসেছি এখানে। সুদানের একদম উত্তরপ্রান্তে এ মরুভূমি। ত্বষ্ক, প্রায় প্রাণহীন, কাঁটাঝোপও চোখে পড়ে না। আমার যেখানে তাঁবু তার চারপাশে কিছু দূরে বেশ কিছু প্রাচীন সৌধ আজও দাঁড়িয়ে আছে। আফ্রিকার প্রখর রৌদ্র, মরুভূমির প্রচণ্ড বালুঝড়, শতাব্দী ধরে চেষ্টা চালিয়েও তাদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। পিরামিড। এক সময় এ অঞ্চল ছিল প্রাচীন মিশরের অন্তর্গত। তিন হাজার বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার উষালগ্নে সুদান মিশরীয়দের কাছে নুবিয়া নামে পরিচিত ছিল। ওই পিরামিডগুলো তাদেরই কীর্তি। গিজা, এসনার মতো নুবিয়ান মরু অঞ্চলও ছিল মিশরীয়দের গোরস্থান। এ অঞ্চলের স্থানীয় নাম ''মৃতের নগরী'।

আমি অবশ্য কোনো ইতিহাসবিদ নই। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে এখানে আসিনি। আমি একজন জিওলেজিস্ট। মুম্বাই শ্রীনিবাসন, জন্মসূত্রে ভারতীয়। কর্মসূত্রে 'রিপাবলিক অব দ্য সুদান'-এর এক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থাতে কাজ করি। তাদের কাজেই আমি এ অঞ্চলে এসেছি কিছু ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করার জন্য। অতি সরলভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এখান থেকে কিছু নুড়ি পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে যাব আমি। এ জায়গার ভূতাত্ত্বিক গঠন বহু বছর ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। আট হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে ছিল ঘন বনভূমি ও জলাভূমি। বহু প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র। আদিম মানবগোষ্ঠী এখানে পশু শিকার করতে আসত। তারপর একদিন প্রকৃতি তার রূপ বদলাতে ত্বরু করল। জলাভূমি, নদী এসব ত্বকিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তৃণভূমি গাছপালা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে এ অঞ্চল পরিণত হল উষর মরুভূমিতে। তবে এ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় মিশরীয় সভ্যতা পত্তনের আগেই। এ অঞ্চলে কিছু গভীর প্রাকৃতিক কূপ বা কুয়ো আছে। যদিও তাতে জলের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু এসব কূপগাত্রের বিভিন্ন

BanglaBook.org

স্তরে ছড়িয়ে আছে ভূ-প্রাকৃতিক বিবর্তনের নানা চিহ্ন। সেখান থেকেই তুলে আনা হচ্ছিল নুড়ি পাথর।

'তুলে আনা হচ্ছিল' বললাম এইকারণে যে দুপুরের পর থেকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যারা কাজ করছিল তারা ফিরে গেছে। কাল রাতে একটা উল্কাপাত হয়েছে এখানে। আকাশ থেকে সোনালি পুচ্ছ সহ গোলাকার এক আগুনের বল নেমে আছড়ে পড়েছে কিছু দূরে একটা পিরামিডের পিছনে। রাত দশটার কাছাকাছি ঘটনা। তাঁবুর সামনে বসে আমি ও আমার সঙ্গীরা মেঘমুক্ত রাতের আকাশে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছি ব্যাপারটা। উল্কাপতনের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল পায়ের তলার মাটিও। যদিও উল্কাপাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, আমরা যাইওনি সেই জায়গাতে, এবং ব্যাপারটা নেহাতই প্রাকৃতিক, কিন্তু এই ঘটনাটা প্রচণ্ড ভীতি সঞ্চার করেছে আমার মজুরদের মনে। ওরা অশিক্ষিত আফ্রিকান যাযাবর গোষ্ঠীর লোক। প্রচণ্ড কুসংস্কারগ্রস্ত। এমনিতেই এ জায়গা 'মৃতের নগরী' বলে প্রথমে ওরা এখানে আসতে চায়নি। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের কাজে এনেছিলাম। যাইহোক, কাজেও মন দিয়েছিল ওরা। কিন্তু উল্কা দর্শনের পরই আজ সকালে উঠে তারা বলল যে, তারা এ তল্লাটে আর থাকবে না। উল্কা দর্শন নাকি মৃত্যু ডেকে আনে! তবুও বুঝিয়েসুঝিয়ে সকালের দিকে তাদের কুয়োতে নুড়ি তুলতে নামিয়েছিলাম। কিন্তু কুয়োতে নেমে একজনের পাথুরে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে মাথা ফেটে গেল। যদিও তার আঘাত মারাত্মক কিছু নয়। তবু তারা দুপুরবেলা কুয়ো থেকে উঠে এসে বলল, উল্কা দর্শনের কুফল ফলতে শুরু করেছে। সে কারণেই মাথা ফেটে এই রক্ত তার! তাদের গ্রামে ফিরতে হবে। সেখানে গিয়ে উল্কা দর্শনের দোষ খণ্ডন করার জন্য মরু গ্রামের জাদুকর ওঝার থেকে তাবিজ নিয়ে কাল ফিরবে তারা। আর ফেরার সময় আমার জন্যও একটা তাবিজ আনবে। কিছুতেই তাদের আর আটকে রাখতে পারলাম না। আমাকে ফেলে রেখে তারা চলে গেল।

তাঁবুতে বসে বসে ভাবছিলাম কাল সকাল পর্যন্ত এই প্রাচীন মরুস্থানের মৃতদের নগরীতে আমি কাটাব কী করে? না, ভূত-প্রেত, অপদেবতা বা উল্কা দর্শনের কুসংস্কারের ভয় আমার নেই। আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। আমার ভাবনার অর্থ হল, একলা এতটা সময় আমি অতিবাহিত করব কী করে? সঙ্গে বইপত্তরও কিছু আনিনি। কোনো সঙ্গী পাওয়া গেলে অন্তত গল্প করে সময় কাটত। কিন্তু এখানে সঙ্গী পাওয়া যাবে কোথায়? সবচেয়ে কাছের মরু গ্রাম পঁচিশ মাইল দূরে। এই তিনদিনের মধ্যে জীবিত প্রাণী বলতে কাল রাতে একটা মরুশিয়াল শুধু চোখে পড়েছে। উল্কাপাতের সময় সম্ভবত ভয় পেয়ে গর্ত ছেড়ে পালাচ্ছিল প্রাণীটা। মানুষ এখানে কই? কিন্তু এরপরই আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল একজন লোকের কথা। আজ সকালে তাকে আমি দূর

BanglaBook.org

থেকে দেখেছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা নীল রঙের লম্বা আরবি পোশাক পড়া একজন বেশ ঢ্যাঙা একটা লোক। যে কুয়োতে আমার লোকেরা কাজে নেমেছিল তার কিছু দূরে একটা পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে পিরামিড গাত্রে কী যেন দেখছিল লোকটা। গত তিনদিন আমাদের কাছাকাছি অন্য কোনো তাঁবু বা লোক চোখে পড়েনি। তাই কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় জানার জন্য তাঁকে ডাকব ভাবছিলাম। কিন্তু তার আগেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল পিরামিডের ভেতরে। আমার ধারণা, লোকটা কোনো পুরাতত্ত্ববিদ অথবা 'ইজিপ্টোম্যানিয়া' হবে। দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই বেশি। 'মিশর ইতিহাসের ভূতগ্রস্ত লোক' বা 'ইজিপ্টোম্যানিয়াক'রা এভাবেই একলা একলা ঘুরে বেড়ায় প্রাচীন মিশরীয় সৌধগুলির আশেপাশে। কাজ করতে গিয়ে মিশর, লিবিয়াতে এ জাতীয় লোক আমি দেখেছি। ওই লোকটাকে পেলেও দু-দণ্ড গল্প করা যেত।

তাঁবুতে বসে লোকটার কথা মনে পড়ায় আমি ভাবছিলাম যে রোদের তাপ কমলে একবার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে খোঁজ করে দেখব আশেপাশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। সেও সম্ভবত একলা। আমাকে পেলে তারও গল্পগুজবে সময় কেটে যাবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি তাঁবুর কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা ছোট্ট ছোট্ট নুড়ি পাথরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম। আজকেই কুয়ো থেকে তোলা হয়েছে ওগুলো। কাঁদামাখা পাথরগুলোর থেকে প্রয়োজনীয় নমুনাগুলো বেছে নিয়ে তা জলে ধুয়ে প্যাকেট বন্দি করতে হবে নিয়ে যাবার জন্য। অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের সিলিকা। কিছু লাইমস্টোনও আছে। তার গায়ে চিহ্ন আঁকা আছে উদ্ভিদের। এই ফসিলগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, সুদূর অতীতে এই মরুভূমি একসময় সবুজ ছিল। পাথরগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা পাথর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গোলাকৃতি, ইঞ্চি তিনেক ব্যাসের চ্যাপ্টা পাথরটার চারপাশে কেমন যেন খাঁজ কাটা। কী সব অস্পষ্ট আঁকিবুকি আছে তার গায়ে। প্রাথমিক অবস্থায় আমি জিনিসটাকে কোনো মোলাস্কার ফসিল বলে ভেবেছিলাম। তাঁবুতে রাখা জল দিয়ে জিনিসটার গায়ের কাঁদামাটি ধুয়ে ফেলতেই সেটি দেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। ফসিল টসিল কিছু নয়, এটা আসলে একটা ধাতব চাকতি। চাকতির চারপাশে ত্রিভুজাকৃতির খাঁজ কাটা। আর সেই খাঁজগুলো সংযোগস্থলে বেশ কিছু দাগ কাটা আছে। দাগগুলো সম্ভবত কোনো পরিমাপজ্ঞাপক চিহ্ন। চাকতির এক পাশে মিশরীয়দের প্রাচীন প্রতীক। ডানাঅলা সূর্য ও অন্য পাশে স্ক্র্যাব বা গুবরে পোকার ছবি। এই ছবি দুটো দেখে জিনিসটা যে অতি প্রাচীন তা বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু জিনিসটা আসলে কী? কোনো যন্ত্রাংশ? ধাতুটাও কেমন সবুজাভ! আমার পরিচিত কোনো ধাতুর মতো নয়। চাকতিটা হাতে নিয়ে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, ঠিক এমন সময় বাইরে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে দেখি তাঁবুর দরজার ঠিক বাইরে

BanglaBook.org

বালির মধ্যে একটা মানুষের ছায়া এসে পড়েছে। তাহলে কি আমার মজুরদের মধ্যে কেউ মত পরিবর্তন করে ফিরে এল? আমি ছায়াটা দেখে উৎসাহিত হয়ে চাকতিটা আমার ব্রিচেসের পকেটে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

২

বাইরে এসে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এ লোকটা আমার দলের কেউ নয়। আপাদমস্তক আরবি আলখাল্লাতে ঢাকা অন্য একজন লোক। মুহূর্তখানেক দেখার পরই তার দীর্ঘ আকৃতি দেখে চিনতে পেরে গেলাম তাকে। আরে? এ তো আজ সকালে দেখা লোকটা। যার কথা কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলাম আমি! লোকটার মুখমণ্ডলের প্রায় সবটাই নীল রঙের কাপড়ে আবৃত। শুধু উজ্জ্বল চোখদুটোই দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে কিছু বলার আগে সে নরম স্বরে বলল, "দেখলাম আপনার লোকজন সব চলে গেল! একা আছেন দেখে পরিচয় করতে এলাম।"

আমি জবাবে বললাম, "হ্যাঁ, আমিও আপনাকে সকালে দেখেছি। তা আপনিও কি একলা নাকি? ইতিহাসের খোঁজে এসেছেন?" সে বলল, "তা অনেকটা ওইরকমই বলতে পারেন। আমার নাম টিরেক্স। তবে নাম শুনে আবার আমাকে ডাইনোসর ভাববেন না। আপনি আমাকে রেক্স বলে ডাকতে পারেন।" এই বলে সম্ভবত মুখের ঢাকার আড়ালে একটু হাসল লোকটা। আমিও একটু হেসে নিজের নাম, পরিচয় ব্যক্ত করে বললাম, "যাক, পরিচয় হয়ে ভালোই হল। তা দুজনেই যখন একলা তখন আপনার অসুবিধা না হলে চলুন একটু বসে গল্প করা যাক।" রেক্স আমার কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে আমার তাঁবুর কাছেই একটা ছোট্ট বালির ঢিপি আঙুল তুলে দেখাল। ও জায়গাতে আমার লোকেরা বিশ্রামের জন্য ছাউনি টাঙিয়ে রেখেছিল। বেশ ছায়া আছে জায়গাটাতে। গরম বাতাসটাও কমে আসছে। সুতরাং তাঁবুতে আর না ঢুকে তার ইশারা অনুযায়ী দুজনেই সেই বালির ঢিপির ওপর গিয়ে বসলাম।

সেখান বসার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কবে এসেছেন এখানে? কত দিন থাকবেন?"

সে জবাব দিল, "কালই এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে আমাকে। কিন্তু যেটা খুঁজছি সেটা না পেলে..." কথাটা আর শেষ করল না সে।

লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারছিলাম সে স্থানীয় কোনো অধিবাসী নয়। তার কথায় কোনো আরবি টান নেই। তাছাড়া মিশরীয় বা লিবিয়ানরা সাধারণত এত ঢ্যাঙা হয় না। রেক্সের জন্মস্থান জানার কৌতূহল হওয়াতে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কোন দেশের নাগরিক?" রেক্স উত্তর দিল,"একসময় এই দেশেরই ছিলাম।" এই বলে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল কিছু

BanglaBook.org

দূরে বালিয়ারির মধ্যে জেগে থাকা সার সার পিরামিডের দিকে। বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। রেক্স যেন পিরামিডগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী যেন ভাবছে।

আমি আবার তার সঙ্গে কথোপকথনে ফিরে আসার জন্য তার উদ্দেশে বললাম, "এই জায়গাটা কেমন অদ্ভুত। জনহীন মরুপ্রান্তরে রোদ-ঝড় উপেক্ষা করে ওই পিরামিডগুলো হাজার হাজার বছর পরেও কেমন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।" আধুনিক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদেরও বিস্মিত করে এইসব স্থাপত্য। সেদিনের মানুষেরা কী কৌশলে যে..."

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রেক্স নামের লোকটা আঙুল তুলে পিরামিড সারির একটা পিরামিডের দিকে দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল, "ওটা খেয়াল করেছেন?"

আমি তাকালাম সেদিকে। সূর্য এখন পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। তার বিদায়বেলার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে পিরামিডগুলোর শীর্ষে। তার মধ্যে একটা পিরামিডের মাথা যেন স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। সূর্যালোক যেন পিরামিডের মাথার কয়েকটা ধাপকে ভেদ করতে পারছে। তবে কাচের মতো স্বচ্ছ দেখানো বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নয়। ওই পিরামিডটাই দেখাচ্ছে রেক্স।

আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, খেয়াল করেছি। ওই পিরামিডের চুড়োটা সম্ভবত অ্যালাবাস্টার পাথরের তৈরি। তাই ওরকম আপাতস্বচ্ছ মনে হচ্ছে। ওই পাথরের তৈরি বেশ কয়েকটা প্রাচীন মূর্তি আমি কায়রো মিউজিয়ামে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি।" এই বলে একটু থেমে আমি বললাম, "ফুঞ্জু যাযাবর উপজাতির আমার মজুর সর্দার গতকাল ওই পিরামিড দেখিয়ে বলছিল ওখানে নাকি 'দেবতার কবর' আছে। একসময় নাকি নুবিয়ান মরুভূমিতে দেবতাদের কবর দেওয়া হত। মরুভূমির যাযাবররা বংশপরম্পরায় এ কাহিনী নাকি শুনে আসছে।"

আমার কথা শুনে রেক্স যে এবার স্পষ্ট হাসল তা বুঝতে পারলাম। সেই পিরামিডটার দিকে চোখ রেখেই সে বলল, "আপনি পিরামিড নিয়ে এখনকার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বিস্মিত হবার কথা কী বলছিলেন?"

যদিও এই ব্যাপারে জ্ঞান আমার সীমিত। তবু তার প্রশ্নের জবাবে কিছু কথা বলার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, "হ্যাঁ, আধুনিক প্রযুক্তিবিদদের কাছেও এগুলো বিস্ময়ের কারণ। ভাবুন তো একবার, সভ্যতার সেই সূচনাকালে সেদিনের মানুষের কীভাবে এসব বিরাট বিরাট পিরামিড বানিয়েছিলেন। কীভাবে এই সমকৌণিক পাথরগুলোকে গাণিতিক নিয়ম মেনে একটার ওপর একটা বসিয়ে পিরামিড রচনা করেছিলেন? তাদের সময় তো ক্রেন ছিল না। কীভাবে তারা ভারী ভারী পাথরের ব্লককে অত উঁচুতে তুলেছিলেন? আমি একটা বইতে একবার পড়েছিলাম যে, গিজার গ্রেট পিরামিড তৈরির ব্যাপারে তার নির্মাণকাল ও শ্রমিক সংখ্যা ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের

BanglaBook.org

বিবরণ সঠিক মানলে সেই হিসাব অনুযায়ী প্রতি দু সেকেণ্ডে একটা পাথরের ব্লক ওপরে তুলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে একটা একটা পাথরের ওজন ছিল দশ টন। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাছেও যা অসম্ভব, তা কোন কৌশলে সম্ভব করেছিলেন প্রাচীন মিশরীয়রা? এ এক অমীমাংসিত রহস্য!"

আমি প্রযুক্তিবিদ নই, আমার স্বল্প জ্ঞানের মধ্যে আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আগন্তুক বলে উঠল, "হ্যাঁ, প্রাচীন স্থাপত্যবিদদ্যা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম অমীমাংসিত আরও কয়েকটা রহস্যের কথা আমিও বলতে পারি। যেমন, পেরুর প্রাচীন ইনকা রাজধানী কুজকোর, সাকসাহুয়ামান দুর্গে বিশাল পাথরের ব্লকগুলোর সংযোগস্থল গলিয়ে জোড়া লাগানো হত কীভাবে? যে ইনকারা চাকার ব্যবহার পর্যন্ত জানত না তারা পাথর গলানোর মতো উত্তাপ সৃষ্টি কীভাবে করত? কীভাবে মেক্সিকোর বর্বর অ্যাজটেক অধিবাসীরা তাদের নরবলি দেবার বিশাল মন্দিরগুলো এমন নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞানে আর স্থাপত্য কৌশলে বানিয়েছিল যে তাদের স্থাপত্যগুলো ভূমিকম্প নিরোধক! অথবা, মায়া সভ্যতার মানুষরা কীভাবে সৌরমণ্ডলীর গ্রহ-নক্ষত্রের নিখুঁত অবস্থান নির্ণয় করে বানিয়েছিল তাদের বিখ্যাত ক্যালেণ্ডার? ব্রুনো, গ্যালিলিও ইত্যাদি সভ্য পৃথিবীর মানুষেরা আগে কীভাবে মায়া জনজাতি জেনেছিল সূর্যকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ তত্ত্ব? কিংবা, ভারতবর্ষের মেহেরৌলির সেই লৌহস্তম্ভ। আধুনিক বিজ্ঞান ইস্পাত তৈরি বহু আগে প্রাচীন ভারতীয়রা কীভাবে সৃষ্টি করেছিল মরিচারোধী লৌহ? ইস্টার দ্বীপে সার সার হাজার টনের মানুষাকৃতি মূর্তিগুলোকেই বা কীভাবে মাটিতে প্রোথিত করেছিল আদিম মানুষরা?" কথাগুলো বলে লোকটা হাসল। আমি তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বললাম, "বাঃ, আপনি এসব ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন দেখছি! তা আপনি কি ইতিহাসের এরকম কোনো অমীমাংসিত রহস্যের খোঁজ করছেন এখানে?"

সে জবাব দিল, "খুঁজতে এসেছি ঠিকই। তবে কী খুঁজছি সেটা আমার জানা।"

আমি বললাম,"আপনার একথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

রেক্স নামের লোকটা যেন আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। চুপ করে তাকিয়ে রইল সেই স্বচ্ছ পিরামিডের মাথার দিকে।

সূর্য দ্রুত পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছে। পিরামিডগুলোর শীর্ষে তার লাল আভা। লোকটা আর কোনো কথা বলছে না। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে সে। যেন তন্ময় হয়ে কী ভাবছে। একসময় মনে হল সম্ভবত সে এবার উঠে দাঁড়াবে। হয়তো তার আর এখানে থাকতে বা আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। আমি তাকে আরও কিছুক্ষণ যদি ধরে রেখে গল্প করা যায়, এই অছিলায় পকেট থেকে সিগারের বাক্সটা বের করে বললাম, "আপনি একটা সিগার খাবেন?"

BanglaBook.org

রেক্স এবার আমার দিকে ফিরে তাকাল, তারপরই আমার হাতের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি কেমন যেন পালটে গেল। আমি সিগারের বাক্সটা খুলতে যেতেই পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। সিগারের বাক্স এটা নয়। বেখেয়ালে পকেট হাতড়ে সেই সবুজ ধাতব চাকতিটা বার করে ফেলেছি। ভুলটা বুঝতে পেরে আমি আবার সেটা পকেটে রাখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই বিস্মিত কণ্ঠে রেক্স বলে উঠল, "ওটা আপনি পেলেন কোথায়? সারা সকাল পিরামিডের ভীতর ওটাই তো খুঁজেছি আমি। যে কুলুঙ্গিতে ওটা থাকার কথা ছিল সেখানে খুঁজে পাইনি। আপনি কোথায় পেলেন ওটা?"

আমিও একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "এটা কি দুর্মূল্য কিছু? আমার লোকেরা আজ সকালে কূপ থেকে পাথরের টুকরোর সঙ্গে এটা তুলে এনেছে। আমি তো বুঝতেই পারছি না এটা কী?"

লোকটা আমার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখের তারা।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কী এটা?"

সে এবার অস্পষ্ট স্বরে বলল, "এটা হল 'দেবতার চাবি।"

"দেবতার চাবি মানে!" জানতে চাইলাম আমি।

রেক্স জিনিসটা দেখতে দেখতে জবাব দিল, "এর অর্থ আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। এ জিনিসটা আমাকে দিতে হবে। আজই এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে আমার। এটা নিয়ে আজ রাতে আমি প্রবেশ করব পিরামিডের অভ্যন্তরে। এই চাকতিটা আপনার কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক দামি।" তার কথা শুনে আমি কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললাম, "ঠিক আছে, আপনাকে এটা আমি দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আপনার অভিযানের সঙ্গী হতে চাই আমি। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। পিরামিডের অভ্যন্তরে ধনরত্ন বা ওই জাতীয় কিছু পেলে তাতে আমি ভাগ বসাব না। আমি শুধু দেখতে চাই আপনি এই চাকতিটা দিয়ে কী করেন।"

আমার প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ কী যে ভাবল লোকটা। তারপর হেসে বলল, "ঠিক আছে, চাকতিটা যখন আপনি খুঁজে পেয়েছেন তখন এ দাবি আপনি করতেই পারেন। এটা এখন আপনি আপনার কাছে রাখুন। মাঝরাতে আমি আসব আপনার কাছে, আপনাকে নিয়ে যেতে" এই বলে জিনিসটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে লোকটা হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঢ্যাঙা দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল পিরামিডগুলোর আড়ালে।

সে চলে যাবার পর আমি চাকতিটা বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পরও তার

BanglaBook.org

মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। এরপরই সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নামল মরুভূমিতে। ঠাণ্ডাও নামতে শুরু হল। মরুভূমির এই নিয়ম, দিনে যত গরম, রাতে তত ঠাণ্ডা। তাঁবুর বাইরে বসে আমি চিন্তা করতে লাগলাম এই অদ্ভুত আগন্তুকের কথা। কীসের খোঁজে লোকটা প্রবেশ করতে চলেছে পিরামিডের অভ্যন্তরে? ধনরত্ন, টাকাকড়ি নাকি কোনো ফারাওয়ের লুকোনো মমির সন্ধানে। বেশ অনেকক্ষণ ভাববার পর আমি তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলাম। খাওয়া সেরে আমার সম্ভাব্য নৈশ অভিযানের প্রস্তুতির জন্য।

৩

রাত ঠিক বারোটাতে সেই দীর্ঘ ছায়া আবার এসে পড়ল আমার তাঁবুর দরজায়। প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লোকটার পরনে সর্বাঙ্গ ঢাকা সেই একই পোশাক। তবে তার সঙ্গে এবার একটা ছোট মতো ধাতব বাক্স আছে। চাঁদের আলোতে বেশ রহস্যময় দেখাচ্ছে তাকে। "আপনি তৈরি? আর চাকতিটা সঙ্গে আছে তো?" আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই সে ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে বালির ওপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত চারদিক অনেক দূর পর্যন্ত দৃশ্যমান। চাঁদ যেন আজ হাসছে। তার আলোতে দাঁড়িয়ে আছে সহস্র বছরের প্রাচীন সার সার পিরামিডগুলো। নুবিয়ান মরুভূমির মেঘমুক্ত আকাশের অগুনতি নক্ষত্ররা ঝিকমিক করছে। যেন কেউ একরাশ হিরের কুচি ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। আমি লোকটার উদ্দেশে বললাম, "আকাশটা কী সুন্দর তাই না? যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন নিজেকে বা এই পৃথিবীকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়! কত অসীম এই মহাকাশ। কত অপার রহস্য লুকিয়ে আছে তার বুকে।" আমার কথা শুনে চলতে চলতে লোকটা হাসল মনে হয়। তারপর বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই। যে ছায়াপথের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান সেই ছায়াপথে তারার সংখ্যা অন্তত দুশো কোটি। আর সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলতে যা বোঝায় তাতে নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা দশ লক্ষ কোটি। আর গ্রহগুলো আবর্তিত হয় নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। পৃথিবী থেকে মাত্র ছ-আলোকবর্ষ দূরে বার্নাড নক্ষত্রেরও দুটো গ্রহ আছে। এই হিসাবে গ্রহের সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে তাতে পৃথিবীর অবস্থান এই বালুকাময় প্রান্তরের একটা বালুকণার মতো অতি নগণ্য। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের জানার পরিধি তো আরও নগণ্য।"

তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে আমি মন্তব্য করলাম, "আপনার অনেক বিষয়ে বেশ জানা আছে দেখছি!"

সে আমার কথায় কোনো মন্তব্য করল না। বাদবাকি পথ অতিক্রম করে একসময় আমাকে নিয়ে উপস্থিত হল সেই পিরামিডের সামনে। যার শীর্ষদেশ বিকালের সূর্যালোকে স্বচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল। মরু উপজাতিরা যাকে বলে দেবতার কবর। পিরামিডের অভ্যন্তরে

BanglaBook.org

প্রবেশ করার আগের মুহূর্তের জন্য একবার থামল লোকটা। আমার উদ্দেশে বলল, "আপনার ভয় করছে না তো? আজ রাতে এক বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন আপনি।"

আমরা প্রবেশ করলাম পিরামিডের অভ্যন্তরে। একটা বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালাল লোকটা। অন্ধকার পাথুরে সুঁড়ি পথ বেয়ে প্রথমে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম আমরা। বহু শতাব্দী সম্ভবত এখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। শত শত বছরের জমাট ধুলো, মাকড়সার জাল সরিয়ে একের পর সংকীর্ণ অলিন্দ, সুঁড়িপথ ভাঙতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমাদের স্পর্শে খসে যাচ্ছে দেওয়ালের ধুলোর স্তর। তার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রাচীন মিশরীয় দেবতাদের নানা চিত্র। অনুবিস, হ্যাথোর, খুনম, ওসিরিস ইত্যাদি নানা দেবতার প্রতিমূর্তি। টর্চের আলোতে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে তাদের দেহের সোনালি অলংকরণ। লোকটা কোনো কথা বলছে না। শুধু এগিয়ে চলেছে। সে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হচ্ছে এ পথ যেন তার নখদর্পণে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন অন্ধকার সুঁড়িপথ বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন দিকে। তার মধ্যে পথ করে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেন এগোচ্ছে সে।

আমি চলতে চলতে তাকে প্রশ্ন করলাম, "এখানে কি এর আগে এসেছিলে?"

সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, অনেক অনেকদিন আগে। যখন আমরা...।" কথাটা শেষ করল না রেক্স।

পিরামিডের গোলকধাঁধা অতিক্রম করে একসময় এসে উপস্থিত হলাম ভূগর্ভস্থ এক কক্ষে। তার চারপাশে নিরেট পাথুরে দেওয়াল। আমি বললাম, "পথ তো শেষ হয়ে গেল। এবার কোনদিকে যাবেন?"

সে জবাব দিল, "না, পথ শেষ হয়নি। বলতে গেলে পথ শুরু হল এবার। পথ এবার করে নেব আমরা।"

আমাকে নিয়ে একটা দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, তারপর হাতের বাক্সটা খুলল। অমনি একটা বিপ বিপ শব্দ করে বাক্সের ভেতর কয়েকটা লাল-নীল আলো জ্বলে উঠল। একটা কি-বোর্ড আর বেশ কয়েকটা সুইচও রয়েছে তার মধ্যে। বাক্সটা যে একটা যন্ত্র তা বুঝতে অসুবিধা হল না আমার। বাক্সর আলোগুলো জ্বলে ওঠার পর লোকটা আঙুল ছোঁয়াল কি-বোর্ডে। আর তখনই নীল রঙের একটা আলোকরশ্মি বাক্স থেকে নির্গত হয়ে একবার চক্রাকারে আবর্তিত হল দেওয়ালের একটা অংশে। আর কী আশ্চর্য। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দেওয়ালের ওই অংশটা খসে পড়ল! ঠিক কেউ যেন ছুরি দিয়ে মাখনের দেওয়াল থেকে একটা বৃত্তাকার অংশ কেটে নিল! ঘটনাটা দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম, "নীল আলোটা কি কোনো লেসার রশ্মি?"

সে জবাব দিল, "তা বলতে পারেন। তবে এ তরঙ্গরশ্মির ক্ষমতা তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি।"

BanglaBook.org

কাজ শেষ হবার পর আবার বাক্স বন্ধ করল লোকটা। তারপর দেওয়ালের সেই ফোকর গলে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করল ওপাশে। সামনেই এক সিঁড়ি উঠে গেছে। আমরা সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

ওপরে ওঠার যেন বিরাম নেই। মাথার ওপর ঢালু ছাদ। দু-পাশের দেওয়াল বহু বর্ণে চিত্রিত। কত রকমের জিনিস চিত্রিত আছে সেখানে। সেসব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা আমাকে নিয়ে কেবল ওপরে উঠেই চলল। মাঝে মাঝে শুধু আমি যখন হাঁফ নেবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, তখন মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়াচ্ছিল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে ওপরে ওঠার পর অবশেষে আমরা থামলাম। আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে খোদিত আছে আকাশদেব হোরাসের বিশাল এক ছবি। রেক্স দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমরা পৌঁছে গেছি"। তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা উত্তেজনা।

আমি বললাম, "কোথায় পৌঁছেছি? এ দেওয়ালটাও লেসার বিম দিয়ে ভাঙবেন নাকি?"

সে বলল, "না। এই দেওয়াল ধাতব। কোনো লেসার বিম দিয়ে এই ধাতুকে ভাঙা বা কাটা যাবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমাও এ দেওয়াল ভাঙতে পারবে না। দিন, এবার আমাকে ওই চাবিটা দিন। ওটা ছাড়া এ দেওয়াল কেউ খুলতে পারবে না।"

আমি পকেট থেকে সেই চাকতিটা বের করে তার হাতে দিলাম। লোকটা চাবিটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালে খোদিত হোরাসের মূর্তির সামনে। টর্চের আলোতে আমার মনে হল চাকতিটা আর দেওয়াল যেন একই ধাতুর তৈরি। দেওয়ালের গায়েও একটা সবুজ ছটা আছে। হোরাস দেবের বুকের কাছে একটা খাঁজকাটা জায়গা আছে। রেক্স চাকতিটা সেখানে বসাতেই খুব সুন্দরভাবে চাকতির দাঁতগুলো দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে বসে গেল। তারপর কম্বিনেশন লক যেভাবে খোলা হয় রেক্স সেভাবে দেওয়ালের খাঁজে ঘোরাতে লাগল সেটা। তাহলে চাকতিটা আসলে সত্যিই একটা চাবি!

চাকতিটা ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একটা ধাতব শব্দ হল, আর তারপরই আকাশদেব দুপাশে ভাগ হয়ে গেলেন। খুলে গেল একটা ছোট্ট ধাতব দরজা। রেক্স চাবিটা খুলে নিয়ে ইশারায় আমাকে অনুসরণ করতে বলল।

তার পিছনে দরজার ওপাশে প্রবেশ করলাম আমি। একটা ত্রিভুজাকৃতির ঘর। একটা হালকা আলোয় ভরে আছে ঘরটা। ঘরের চারপাশে তাকাতেই চমকে উঠলাম। ঘরটা যেন একটা এরোপ্লেনের ককপিট। নানা ধরনের বৈদ্যুতিক আধুনিক প্যানেল-যন্ত্রপাতি বসানো আছে ঘরটাতে। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে সেই সবুজাভ ধাতুর তৈরি বিরাট এক শবাধারের মতো বাক্স। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এ কোন জায়গাতে এলাম আমরা?"

BanglaBook.org

রেক্স বলল, "দেওয়ালের কাছে যান, বুঝতে পারবেন।"

তার কথা শুনে দেওয়ালের কাছেই যেতেই চমকে উঠলাম। অনেক ওপর থেকে বাইরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! চন্দ্রালোকিত মরুভূমি, আশেপাশের পিরামিড, মায় আমার তাঁবু পর্যন্ত! আকাশের চাঁদটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ ঘরের আলোটা আসলে চাঁদেরই আলো!

রেক্স বলল, "আপনি যে পিরামিডের মাথাটা অ্যালাবাস্টারের তৈরি ভেবেছিলেন সেটা আসলে বিশেষ ধরনের ক্রিস্টালের তৈরি, যে প্রয়োজনে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দুই-ই হতে পারে। এ এক কঠিনতম অ-ভঙ্গুর ক্রিস্টাল। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই পিরামিডের শীর্ষদেশে।" কথাগুলো বলতে বলতে সে গিয়ে উপস্থিত হল ঘরের মাঝে রাখা বাক্সর সামনে। তারপর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল বাক্সটার দিকে। বাক্সের গায়েও খোদিত আছে ডানাঅলা হোরাস দেবের ছবি। তাঁর বুকের কাছেও চাবি বসানোর খাঁজ। তার পিছনে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর বললাম, "এ বাক্সতে কী রাখা আছে?"

রেক্স বলল, "দেখাব আপনাকে। এই বাক্সটার জন্যই তো আমার অত দূর থেকে এখানে আসা।" এই বলে সে চাবিটা বাক্সর গায়ে লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান মাত্র। তারপরই ডালাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিমেল স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। আমার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল তাতে। বাক্সর মধ্যে একটা শীতল কুয়াশার আবরণ ছিল সেটা সরে যেতেই রেক্সের সঙ্গে আমিও ঝুঁকে পড়লাম বাক্সর ওপর। আর তারপরই হতবাক হয়ে গেলাম আমি। বাক্সর ভিতর একটা স্বচ্ছ ক্রিস্টালের আধারে শুয়ে আছে একজন। না, এ কোনো ন্যাকড়া জড়ানো, পোকায় কাটা, মাংসহীন হাড়সর্বস্ব মিশরীয় মমি নয়। এ একজন সর্বাঙ্গসুন্দর ঘুমন্ত মানুষ। তবে মানুষের সঙ্গে তার একটা পার্থক্য আছে। তার কাঁধের দু-পাশ থেকে নেমে এসেছে সোনালি রঙের দুটো ডানা! ডানাওলা মানুষ?

এত বিস্মিত আমি জীবনে কোনোদিন হইনি। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে আমি বলে উঠলাম, "এ কে?"

রেক্স শান্ত স্বরে বলল, "এ হল তাদেরই একজন, যারা সভ্যতার উষালগ্নে ছায়াপথ অতিক্রম করে নেমে এসেছিল পৃথিবীর মাটিতে। পৃথিবীর স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে যারা প্রথম শিখিয়েছিল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশবিদ্যা। মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিসম্পন্ন, যারা মানুষকে সাহায্য করেছিল গিজার পিরামিড, অ্যাজটেক মন্দির গড়তে, শিখিয়ে ছিল কীভাবে তৈরি করতে হয় মায়া ক্যালেন্ডার অথবা মরিচাহীন ইস্পাত। ইতিহাসের আপনার সেই অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরগুলো যাদের জানা ছিল, বিভিন্ন সভ্যতার পৌরাণিক গাথায় যাদের বর্ণনা করা হয়েছিল 'দেবতা' বলে। এ তাদেরই একজন।

BanglaBook.org

পৃথিবীতে কাজ শেষে আবার যদি পৃথিবীর কোনো প্রয়োজন হয় — এই ভেবে হিমায়িত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে ওকে। পাঁচ হাজার বছর ধরে ঘুমোচ্ছে ও। এবার ওর ফিরে যাবার সময় হয়েছে।"

রেক্সের কথা শুনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আমার মাথার ভিতরটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ক্রিস্টালের ঘরের ভিতর শৈত্যপ্রবাহ ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না ঠাণ্ডা। রেক্স একসময় বলল, "চলুন, এবার আপনাকে নীচে নামাই।" রেক্সের পিছনে পিছনে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো নীচে নামতে শুরু করলাম। যে পথে আমরা ওপরে উঠেছিলাম রেক্স কিছুটা সে পথে নেমে রশ্মি দিয়ে পাথর কেটে অন্য পথ বার করে বেশ দ্রুতই বাইরে বের করে আনল আমাকে। পিরামিডের বাইরে চন্দ্রালোকিত বালুপ্রান্তরে আমরা এসে দাঁড়ালাম। মাথার উপর আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর ঝিকমিকে তারাগুলো যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমাকে নিয়ে কয়েক পা এগোবার পর দাঁড়িয়ে গেল রেক্স। তারপর আমার উদ্দেশে বলল, "আপনি এবার তাঁবুতে ফিরে যান। পিরামিডের মধ্যে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে নিয়ে আমাকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। আর আমাদের সাক্ষাতের স্মৃতি হিসাবে আপনি এটা রেখে দিন।" এই বলে সে তার পোশাকের ভেতর থেকে বলের মতো একটা সবুজাভ ধাতুপিণ্ড বের করে তুলে দিল আমার হাতে। সম্ভবত এই ধাতু দিয়েই তৈরি সেই দেবতার চাবি। এরপর সে মৃদু হেসে বলল, "তাহলে চলি বন্ধু। আর আপনার সঙ্গীরা ফিরে এলে তাদের বলবেন, এখানে আর উল্কাপাত হবে না। আপনাকে বলি ওটা আসলে উল্কা ছিল না।" এই বলে পিছনে ফিরতে যাচ্ছিল রেক্স। আমি তার উদ্দেশে বললাম, "একটু দাঁড়ান। আপনার সঠিক পরিচয়টা? কোথায় ফিরে যাবেন আপনি?"

রেক্স থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার কথা শুনে। আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে খসিয়ে ফেলল দেহের আলখাল্লা। আমি দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দর পুরুষ। আর তার কাঁধ থেকে নেমে এসেছে দুটো সোনালি ডানা! ঠিক সেই পিরামিডের কফিনে শায়িত মানুষটার মতো! চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে সেই দুটো পাখা! টি-রেক্স এরপর একবার মৃদু হাসল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোল পিরামিডের দিকে।

আমি ফিরে এলাম আমার তাঁবুর কাছে। বিস্ময়ের ঘোরে তখন আচ্ছন্ন আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি খেয়াল করলাম, যে পিরামিডে আমি গেছিলাম তার শীর্ষদেশে নানা রঙের আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। একটা সার্চলাইটের মতো ঘূর্ণায়মান তীব্র আলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সে আলো আমাকে, আমার তাঁবুকেও স্পর্শ করছে। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিরামিডের মাথাটা হঠাৎ সোনালি আলোতে ভরে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উঠল। আর তার পরমুহূর্তেই পিরামিডের উজ্জ্বল আভা যুক্ত মাথাটা ছিটকে আকাশে উঠে গেল। আমার পায়ের নীচের মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা হিস হিস শব্দ করে সেই সোনালি ত্রিভুজ একবার পাক খেল মরুভূমির আকাশে, তারপর উল্কার গতিতে ধাবিত হল মহাশূন্যের দিকে। টি-রেক্স তার সঙ্গীকে নিয়ে যাত্রা করল হয়তো অন্য কোনো ছায়াপথে নিজেদের বাসস্থানে অথবা অন্য কোনো গ্রহে—যেখানকার অধিবাসীদের হয়তো উন্নত করে তুলবে তারা। আকাশের লক্ষ তারার মাঝে ক্রমশ অপসৃয়মান একটা আলোকবিন্দুর দিকে হাত নেড়ে আমি বললাম, "বিদায় বন্ধু"।

পুনশ্চ: — সপ্তাহখানেক পর 'সুদান ক্রনিকাল'-এ একটা খবর ছাপা হয়েছিল—"শ্রীনিবাসন নামে এক ভারতীয় জিওলিজস্ট স্থানীয় এক সংস্থার হয়ে নুবিয়ান মরুভূমিতে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণার কাজে গিয়ে একটা কূপের মধ্যে একটা ধাতবপিণ্ড কুড়িয়ে পান। সেই ধাতবপিণ্ড তিনি পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠালে তারা জানাচ্ছেন যে, পৃথিবীর পরিচিত কোনো ধাতবখণ্ডর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। আধুনিক বিজ্ঞান কোনোভাবেই অজানা মৌলে তৈরি এই ধাতুখণ্ডকে ভেদন বা ছেদন করতে পারছে না। যেদিন ওই ধাতুখণ্ডটি উদ্ধার হয় তার আগের দিন ওই অঞ্চলে উল্কাপাত হয়। বিজ্ঞানীদের একাংশের ধারণা ওই উল্কার সঙ্গেই বহির্বিশ্বের কোনো স্থান থেকে ধাতুখণ্ডটি পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে। যিনি ওই ধাতব বলটি পেয়েছেন তাঁর ইচ্ছানুসারে বিজ্ঞানীরা ওই অজানা ধাতুর নামকরণ করেছেন—'টি-রেক্স'। যদিও এই অদ্ভুত নামকরণ কেন তা আমাদের জানা নেই।"